ব্রাহ্মণ – পঞ্চম অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

ব্রাহ্মণ

সংহিতা সাহিত্য হ'ল আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি ও মন্ত্রগানের কাব্য ও গীতিকা; যে সমস্ত অনুষ্ঠানে এগুলি প্রযুক্ত হয়, ব্রাহ্মণ সাহিত্য প্রাথমিকভাবে তাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট : যজ্ঞের প্রয়োজন, পদ্ধতি-প্রকরণ ও সুফলসমূহ তাতে বিবৃত হয়ে থাকে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ একত্রে কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কর্মসংক্রান্ত অধ্যায় নামে বিখ্যাত, কেননা এদের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু নয়। আপস্তম্ব তাই বলেছেন : 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্'।

নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রচুর অংশই রচনাকালের দিক থেকে সংহিতার শেষ পর্যায়ের সমকালীন; তবু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল সাহিত্যমাধ্যম ও বৈদিক সাহিত্যে পৃথক পর্যায়রূপে ব্রাহ্মণগুলি সংহিতার তুলনায় পরবর্তী যুগেই রচিত হয়েছিল। আমরা নিশ্চিতভাবেই অনুমান করতে পারি যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিপুল অংশই খ্রিস্টপূর্ব দশম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে প্রণীত। ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুকে বিধি ও অর্থবাদ (অনুজ্ঞা ও ব্যাখ্যা) রূপে নির্দেশিত করে। অনুজ্ঞা অংশে যজ্ঞানুষ্ঠানে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বিবৃত হয়। অন্যদিকে অর্থবাদ অংশে যজ্ঞকর্ম বিষয়ে পালনীয় নিয়মাবলী নির্দেশিত এবং কর্মকাণ্ডের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, কাহিনী ইত্যাদি বিবৃত।

আপাতদৃষ্টিতে কখনো কখনো দুটি প্রাসঙ্গিক নিয়ম পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। এই অংশে কখনো একটি বিশেষ কর্ম পদ্ধতিকে অপর কোনো পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করা হয়, কখনো যজ্ঞানুষ্ঠানকে নানাবিধ প্রহ্লকথার সাহায্যে, এমনকি মাঝে মাঝে কাল্পনিক বুৎপত্তির সাহায্যেও ব্যাখ্যা করা হয়। ফলত অর্থবাদই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দীর্ঘতর ও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। সংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যরূপে এ অংশের ভূমিকা সম্পর্কে ব্রাহ্মণ রচয়িতগণও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। 'প্রবচন', 'প্রোক্ত' 'বিবরণী' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্য চরিত্রগতভাবে বিশ্লেষণাত্মক।

'ব্রাহ্মণ' শব্দটি ব্রহ্মন্ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন যার মৌলিক অর্থ হলো গূঢ়াশক্তিসম্পন্ন শব্দ; সাধারণ ভাষা থেকে পৃথক এজাতীয় শব্দে ঐশী শক্তি ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই শব্দনিচয়কে সৃষ্টিমূলক গূঢ় ক্ষমতাসম্পন্ন, আরোগ্যদায়ক, বলবর্ধক, ক্ষতিকারক বা শাস্তিদায়ক বলে মনে করা হত। আপাতদৃষ্টিতে এ সাহিত্য মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি অর্থাৎ সমাজের আধ্যাত্মিক অভিভাবকদের বিশিষ্ট সম্পত্তি। এরকম একটি সম্পূর্ণ বিবৃতি বা এগুলির সমষ্টি যে সমগ্র অনুশাসন কিংবা এগুলির অংশে সংশ্লিষ্ট দেবকাহিনীকেও 'ব্রহ্ম' বলা হতো। আবার যিনি তা' উচ্চারণ করতেন, জানতেন বা যজ্ঞানুষ্ঠানে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন— তাকেও বলা হত 'ব্রহ্ম'; সমস্ত পৃথক ব্রহ্ম' উক্তির যোগফল সামূহিকভাবে 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যরূপে পরিচিত ছিল।

মূলত এ-সব পবিত্র শক্তিযুক্ত বাণী যজ্ঞবিদ্যার প্রবীণ বা সম্মানিত শিক্ষকদের দ্বারা উচ্চারিত হত, তাদের দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হত। ব'লে তাদের দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞকর্মের জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি পুরোহিত সমাজে অবশ্য শিক্ষণীয় বলে গণ্য ছিল। এভাবে শিক্ষক পরিবারগুলিতে বহু প্রজন্ম ও

বহু যুগ ধরে ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় পূর্বকথিত প্রাজ্যোক্তিসমূহ সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে এটি একটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক সংহিতাগ্রন্থের জন্যেই যে সাধারণত, একাধিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, এই তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দেবকাহিনীর চেয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান অনেক বেশি বিতর্কমূলক ছিল কেননা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহ যেখানে বৈদিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক পরিচয় বহন করছে, সংহিতা সাহিত্য সেক্ষেত্রে (বিশেষত ঋক, সাম ও অথর্ব) দেবকাহিনীগুলির বিবরণ। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সংহিতা সাহিত্যে অথর্ববেদের বিলম্বিত প্রবেশের অন্যতম প্রমাণ এই যে, অন্যান্য সংহিতার যেখানে একাধিক ব্রাহ্মণ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ মাত্র একটি। যাইহোক, রচনাশৈলীর দিক দিয়ে যজুর্বেদে বৈশিষ্ট্য আছে কেননা সাহিত্যের মাধ্যমরূপে তা' সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ঠিক মধ্যবর্তী স্তরে আছে বলে একদিকে যেমন সংহিতা রচনা প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিনিধি, অন্যদিকে তেমনি আনুষ্ঠানিক সাহিত্যের প্রকৃত পূর্বগামীও এই সংহিতাটি।

সামূহিক নির্জ্ঞনের ফসলরূপে দেবকাহিনীগুলি যেখানে স্পষ্ট তাৎপর্যযুক্ত, অন্তর্নিহিত প্রতীকী তাৎপর্যের জন্যে যজ্ঞানুষ্ঠান সেখানে দ্ব্যর্থবোধক। বিভিন্ন পরিবার ও কর্তৃত্ব অনুযায়ী তার তাৎপর্য পরস্পরভিন্ন হওয়ায় সহজেই তা' বিতর্কের সৃষ্টি করে, ফলে আমরা বহু সমান্তরাল সমপ্রাধান্য বিশেষজ্ঞের সম্মুখীন হই। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াই নানাভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব; কোনো একটি দেবকাহিনীর বিশেষ ব্যাখ্যার সঙ্গে যেহেতু অনুষ্ঠানকে সমন্বিত করতে হয়, বহু ক্ষেত্রেই তাই সর্বজনগৃহীত বিশেষ ব্যাখ্যার সঙ্গে অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তাই, বহু ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হই— যার প্রত্যেকটিই হয়ত বিশেষ কোনও দেবকাহিনীর অবচেতন ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে। বস্তুত, এজন্যই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। ব্রাহ্মণ

সাহিত্যের রচয়িতারা যাস্ক-কথিত অধিযজ্ঞ পক্ষের অন্তর্গত, যেহেতু তাদের কাছে যজ্ঞানুষ্ঠানই সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠভেদ (ব্রাহ্মণ)

প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে এক বা একাধিক 'ব্রাহ্মণ' সংশ্লিষ্ট রয়েছে; এটা থেকে অনুমান করা যায় যে, আবৃত্তি বা গীতির উপাদানকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানমূলক

ব্যাখ্যামূলক উপাদান যুক্ত হচ্ছিল। সূত্রসাহিত্য অন্তত তেইশটি ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে, যদিও এদের মধ্যে সবগুলি আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রধান :–অহরক, কঙ্কত, কালবিবি, চরকছাগলেয়, জাবালি, পৈঙ্গায়নি ভাল্লবি, মাসসরাবি, মৈত্রায়ণীয়, রৌরুকি, শায্যায়ন, শৈশালি, স্বেতাশ্বতর ও হরিদ্রাবিক। এই ব্রাহ্মণগুলির লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ : পূর্ববতী রচনাগুলির সারাংশ পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাওয়া; পুনরাবৃত্তির ফলে কিছু কিছু রচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া এবং সাধারণভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপারটিরই প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়া। কিছু কিছু পুরোহিত পরিবার তাদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ' গ্রন্থসহ অধিক ক্ষমতাবান ও জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা সম্ভবত সম্পূর্ণত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, কালক্রমে তাদের পারিবারিক দুর্বলতর ব্রাহ্মণ রচনাগুলি ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

ঋগ্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ দুটি হ'ল ঐতরেয় ও কৌষীতকি (দ্বিতীয়টি শাখায়ন নামেও পরিচিত)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মোট চল্লিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত;

প্রত্যেকটি অধ্যায় আটটি পঞ্চকে (বা পঞ্চিকায়) বিভক্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী এ গ্রন্থের রচয়িতা মহীদাস ঐতরেয়। সম্ভবত, এই ব্রাহ্মণটি পূর্বপ্রচলিত কিছু রচনার সংকলন। এর প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল সোমযাগ, এবং অগ্নিহোত্র (অগ্নিদেবের প্রতি প্রাত্যহিক দুগ্ধ-হব্যদান)। রাজসূয়-যজ্ঞও এতে বর্ণিত হয়েছে। কীথের অভিমত এই যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে জৈমিনীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীনতর–এমনকি, তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্রাহ্মণ গোত্রের অংশগুলি অপেক্ষাও ঐতরেয়কে প্রাচীনতর বলা চলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাশৈলী সাধারণভাবে বর্ণনাত্মক ও মাঝে মাঝেই প্রসঙ্গবিচ্যুত। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সম্বন্ধে এতে যে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে, তা বহুলাংশে যাস্কের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়; সম্ভবত এই দুটি গ্রন্থ রচনাকালের দিক দিয়ে পরস্পরের নিকটবর্তী ।

যদিও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণত ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ পরস্পর সংলগ্ন, তবু কিছু কিছু অংশে আবার দুটি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবেই পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করেছে। সম্ভবত, এটা প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দ্বিধা বিভাগের ইঙ্গিত বহন করেছে; যাজ্ঞিক পণ্ডিতদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ সম্পর্কে মতভেদ হওয়ার ফলেই সম্ভবত তাঁরা অভিন্ন মূল গ্রন্থকে বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ দশটি অধ্যায় কৌষীতকিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত, এই অংশে ঐতরেয়তে পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়েছিল। কৌষীতকির প্রথম ছাটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হ'ল : অগ্ন্যাধান, দর্শপূর্ণমাস ও চতুর্মাস্য। পরবর্তী বাইশটি অধ্যায়ে শুধুমাত্র সোমযাগই আলোচিত হয়েছে; এই অংশ অন্যটির তুলনায় অর্বাচীনতর; যেহেতু শৈলীগত বিচারে এটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পাদনার দিক দিয়ে আরো সুবিন্যস্ত। কিন্তু অন্যদিকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে বহু ব্যক্তির প্রয়াস সৃষ্ট অসংলগ্ন 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় রচনার একটি বিশৃঙ্খল সংকলন বলেই মনে হয়।

প্রাচীনতর অভিন্ন ব্রাহ্মণের সম্ভাব্য বিভাজনের আরো একটি কারণ হ'ল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভৌগোলিক পটভূমিকায়, যেখানে কুরুপাঞ্চাল ও বশউশীনর অঞ্চল, কৌষীতকিতে সেখানে নৈমিষারণ্য। এই তথ্যটি ঐতিহাসিক কালক্রমের দ্বারা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভিন্নতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে : আর্যরা যখন দক্ষিণপূর্বদিকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, সে সময় রচিত অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম হ'ল কৌষীতকি । এটি যজুর্বেদের (সংহিতা ও ব্রাহ্মণ) শেষাংশের ব্রাহ্মণ গোত্রের অংশগুলি রচনার সমকালীন; সম্ভবত, অথর্ববেদও তখনই সংকলিত হচ্ছিল। বৈদিক দেবসঙ্ঘে বিলম্বে আগত ঈশান মহাদেবের উল্লেখ এখানে পাই। অর্বাচীনতা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ছাড়াও অধিক পরিশীলিত ভাষা প্রয়োগের কেন্দ্র উত্তর ভারতে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে আসত তার উল্লেখও কামরা লক্ষ্য করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বহুগুণ বধিত হ'ল। তাই কৌষীতকির পরবর্তীর অংশে প্রায়ই বিশেষরূপে পিঙ্গ ও কৌষীতক-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে–বিশেষত যজ্ঞবিষয়ে কৌষীতককে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; অথচ এই নামগুলি ঐতরোয়ে মাত্র একবার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সামবেদ সমৃদ্ধতম। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পৌঢ় বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত নাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে পাঁচশটি অধ্যায় রয়েছে। হিন্টার নিৎসের মতে এটি প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির অন্যতম এবং কিছু কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য একে অনন্য করে তুলেছে। এ ব্রাহ্মণটি পড়ে যে নীরস ও শুষ্ক ব'লে মনে হয়, সম্ভবত তার কারণ এই যে, এর অতীন্দ্রিয় প্রবণতার আতিশয্য। পরবর্তী প্রজন্মের নিকট সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তবে, এই গ্রন্থের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, এতে বহু দেবকাহিনী ও লোকশ্রুতি সংকলিত হয়েছে।

সামবেদের ব্রাহ্মণরূপে এর মুখ্য আলোচ্য বিষয় হ'ল সামমন্ত্র, সামগানের পদ্ধতি ও উপলক্ষ্য; সংশ্লিষ্ট অতিপ্রাকৃত কাহিনী ও তৎপ্রসূত সুফল। অগ্নিষ্টোম থেকে শুরু করে বিশ্বসৃজাময়ন (কিংবদন্তী অনুযায়ী একসহস্র বর্ষব্যাপী একটি যজ্ঞ) পর্যন্ত মোট সাতাশি ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠান এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে নির্দেশিত ক্রম অনুযায়ী যজ্ঞগুলি এখানে বিন্যস্ত।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ প্রকৃতপক্ষে সামবেদ সংহিতার সম্পূরক একটি রচনা। এই ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে প্রচুর যজুর্মন্ত্র থাকায় স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহিত্যমাধ্যমরূপে ব্রাহ্মণটি যজুর্বেদীয় আনুষ্ঠানিক রচনারই যুক্তিযুক্ত ধারাবাহিক অভিব্যক্তি। রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ দিক অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোমের প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হই। কুরু ও পাঞ্চাল অঞ্চল এই গ্রন্থের ভৌগোলিক পটভূমিকা নয়; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের অববাহিকা অঞ্চল এর পৃষ্ঠভূমি।

ষড় বিংশ ব্রাহ্মণ স্পষ্টতই পঞ্চবিংশের ধারাবাহিক সম্প্রসারণ। এই গ্রন্থ ছাটি প্রপাঠক ও সাতচল্লিশটি খণ্ডে বিভক্ত। একাহ অনুষ্ঠানের জন্যে প্রযোজ্য রহস্যগূঢ় সুব্রহ্মণ্য সূত্র এর প্রধান বিষয়বস্তু। এর মধ্যে কিছু কিছু অথর্ববেদীয় বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে যা মূলত শত্রুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এবং ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে বর্ণনার মধ্যে যা সবিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে। আষেয় কল্পের মত পরবর্তী রচনায় এই গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত বলে আলোচ্য ব্রাহ্মণটি অন্তত এইসব রচনার তুলনায় প্রাচীনতর। এর মধ্যে প্রধানত– প্রায়শ্চিত্ত ও অভিসম্পাতের সূত্রগুলি রয়েছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মতোই এই গ্রন্থের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল সাম্যমন্ত্র ও সেগুলির অতীন্দ্রিয় অনুষঙ্গ। তেমনি সাধারণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের মতোই এই গ্রন্থে আছে বিভিন্ন প্রত্নকথা, নিরুক্তি; বিশেষত কারুবিদ্যা সম্পর্কে প্রযুক্ত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত ও

আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। দেবতা ও দানবদের যুদ্ধসম্পর্কিত কাহিনীগুলি নতুন অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রস্তাবনারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সমস্ত সামবেদীয় ব্রাহ্মণের মতো এই গ্রন্থেও সূত্র ও ছন্দগুলির ব্যাখ্যা অতিপ্রাকৃতস্তরে। বিভিন্ন সূক্তের আনুষ্ঠানিক বিনিয়োগও এতে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবকাহিনী এবং যজ্ঞভূমির নিকটে বিচরণশীল দানব ও রাক্ষসদের বিনাশসাধনের জন্যে উদ্বেগ ও ধ্বংসপ্রচেষ্টা এই ব্রাহ্মণের সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিছু কিছু প্রত্নকথা সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও হেতুসন্ধানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, আবার কিছু কিছু উপনিষদের ভাবনায় নিজ্ঞাত। প্রধান ব্রাহ্মণগুলির মতো এই গ্রন্থেও সামবেদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট পুরোহিত ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত কারুবিদ্যামূলক শব্দের ছদ্ম ব্যুৎপত্তি দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত, বিনাশাত্মক ইন্দ্রজাল, যুপকাষ্ঠ, অগ্নিহোত্র, 'স্বাহা' শব্দের উচ্চারণ। ('স্বাহা' এখানে দেবীরূপে গণ্য) ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই অতীন্দ্রিয় অনুষঙ্গ ব্যাঘাত হয়েছে। 'পলাশ' (আক্ষরিক অর্থে 'মাংসাশী' অর্থাৎ রাক্ষস) শব্দের মধ্যে সংখ্যাবিষয়ক অতীন্দ্রিয় প্রবণতা ও শুভকর ইন্দ্রজালি লক্ষণীয়। দৈবত ব্রাহ্মণ দুটি ভাগে বিভক্ত ও একান্নটি সংক্ষিপ্ত সূত্রের সংকলন। 'অদ্ভূত' ব্রাহ্মণ এরই পরিশিষ্ট, প্রকৃতপক্ষে বড়বিংশের শেষতম অধ্যায়ের সঙ্গে সংযোজিত অংশ। কিছু কিছু সামবেদীয় সূত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে; যেহেতু এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্যবিষয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা, ভাবী অমঙ্গলের পূর্বসূচনা ও তা' নিবারণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান এবং শস্যহানি, বজ্রপাত ও ভূমিকম্পজাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণের উপযুক্ত ক্রিয়াকল্প। 'প্রতিমা'র উল্লেখ থাকায় এই গ্রন্থের রচনাকাল বহু পরবর্তী যুগের বলে নির্দেশ করা সম্ভব।

'শাট্যায়ন' ব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত বহু উদ্ধৃতি প্রকৃতপক্ষে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে খুঁজে পাওয়া যায়। যেহেতু 'শাট্যায়ন ব্রাহ্মণ' নামে কোনো গ্রন্থ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, তাই খুব সম্ভব এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদানই জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর

মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় গ্রন্থেই সামমন্ত্র, গায়কদের কর্তব্য ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানবিশেষত সোমযোগের বিভিন্ন রূপান্তর বিবৃত হয়েছে। তবে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ যেখানে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী, সেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণটিতে কিছু কিছু প্রত্নকথা ও কিংবদন্তীও বিবৃত।

ভাষাতাত্তিক বিচারে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীনতর। জৈমিনীয়তে এমন কিছু অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হয়েছে (যেমন মহাব্রত ও গোসাব) যেগুলি পঞ্চবিংশে পাওয়া যায় না; সম্ভবত, এই দুই গ্রছেবি মধ্যবতী পার্থক দুটি যজ্ঞানুষ্ঠানগত ঐতিহ্যের ভিন্নতার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল—একটি গ্রন্থে আপাও দৃষ্টিতে বর্বর জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান ও স্থান পেয়েছিল অনাগ্রন্থে তা" দেখা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে প্রচুর প্রত্নকথা ও লোকশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলেই তা' অপেক্ষাকৃত পরবর্তী, অধিক বিস্তৃত ও ব্যাপকতর রচনারূপে প্রতিভাত হয়।

বর্তমানে 'ছান্দোগ্য' ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদ। একটি নির্দিষ্ট শাখার অন্তর্গত সমস্ত সমাবেদীয় পাঠের শ্রেণীগত নামরূপে ছান্দোগ্যকে যেহেতু গ্রহণ করা হয়, তাই এমনও হতে পারে যে, মূলত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ও অদ্ভুত ব্রাহ্মণ একত্রে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণকে গঠন করেছিল। প্রচলিত পাঠে প্রথম দুটি অধ্যায় পাওয়া যায় না, আবার এর শেষ আটটি অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ গড়ে উঠেছে।

সামবেদের গৌণ ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে 'দেবতাধ্যায়' নামের ছোট উপব্রাহ্মণটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র সারগ্রন্থ এবং নামকরণের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে

যে, এতে সেইসব দেবতাদের নামের তালিকা রয়েছে যাদের উদ্দেশে সাম্যমন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত তথাকথিত 'সংহিতোপণিষদ' ব্রাহ্মণ স্পষ্টতই পরবর্তীকালের রচনা; এখানে শিক্ষকদের প্রতি প্রদত্ত দক্ষিণই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই গ্রন্থে প্রধানত সামমন্ত্র গানের সুফল এবং সুরনিবন্ধ শব্দের গায়ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বংশ' ব্রাহ্মণের নামের মধ্যেই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থে শুধুমাত্র সামবেদের অধ্যাপকদের বংশতালিকা রয়েছে।

বহু পরবর্তীকালের রচনা 'সামবিধান ব্রাহ্মণ'কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন, কেননা এর বিষয়বস্তু সূত্র সাহিত্যেরই কাছাকাছি। জীবনের মূলাধার রূপে সুর ও তালকে মহিমান্বিত করা ছাড়াও এই গ্রন্থ অমঙ্গল, দানবশক্তি ও বিবিধ প্রকারের বিপদ নিবারণের উপায় এবং বাস্তব জীবনের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পদ্ধতি বিবৃত করেছে। ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক ইন্দ্রজালের ভূমিকা, বিশেষত দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এতে বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। এই গ্রন্থে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়েছে; তবে সবচেয়ে কৌতুহলপ্রদ তথ্য এই যে, গ্রন্থের শেষে ভারতমাতার একটি ভাবমূর্তি; কল্পিত মাতৃভূমির উত্তরসীমায় হিমালয় ও দক্ষিণে কন্যাকুমারী; এই দেবীর উপাসনাই মোক্ষের ধ্রুব উপায়। আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার উল্লেখও এতে রয়েছে এবং এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই গ্রন্থকে বৈদিক যুগের চেয়ে স্মৃতির অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের রচনা বলেই নির্দেশিত করা উচিত।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটিমাত্র ব্রাহ্মণ আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তৈত্তিরীয়। তৃতীয় ও শেষ অধ্যায় ছাড়া এ গ্রন্থটির অন্যান্য অংশকে তৈত্তিরীয় সংহিতার অবিচ্ছিন্ন সংযোজন রূপেই গণ্য করা চলে-সমগ্র ব্রাহ্মণটি বারোটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। সামগ্রিকভাবে আপাস্তম্বকেই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু শেষ তিনটি প্রপাঠকে লেখক রূপে কঠ উল্লিখিত হয়েছে, গ্রন্থের উপসংহারেও রয়েছে কঠোপনিষৎ ।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা শতপথ ব্রাহ্মণ, এটি শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত। যজুর্বেদ সংহিতার মতো এই ব্রাহ্মণটিও দুটি শাখায় বিভক্ত,-কাশ্ব ও মাধ্যন্দিন-রূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কথা শাখায় সতেরোটি কাণ্ড, সেগুলিও আবার প্রপাঠকে বিভক্ত। মাধ্যন্দিন শাখা থেকেই এই ব্রাহ্মণের নামকরণে 'শতপথ' শব্দটি ব্যবহাত হয়েছে; কেননা মাধ্যন্দিন শাখায় চৌদ্দটি কাণ্ড একশটি অধ্যায় বা আটষট্টিটি প্রপাঠকে উপবিভক্ত–এ ছাড়াও ক্ষুদ্রতর বিভাগ এই গ্রন্থে চারশ আটত্রিশটি ব্রাহ্মণে ও সাতহাজার ছশ চবিবশটি কণ্ডিকা রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত শাখায় উদ্ধারী, রাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে তিনটি অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রে দুটি শাখার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন কতকটা পরবর্তীকালে হলেও এর বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচুর প্রাচীনতর উপাদান রয়েছে। এই গ্রন্থে রুদ্রকে পরবর্তীকালের মহাদেব" নামে অভিহিত করা হয়েছে; আমরা আরও একজন পরবর্তী দেবতা, "পুরুষ নারায়ণের প্রথম উল্লেখ এখানে লক্ষ করি; পরবর্তী অর্ধদেবতা কুবের বৈশ্রবর্ণেরও প্রথম উল্লেখ এখানেই পাওয়া যায় ।

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত দুজন রচয়িতার মধ্যে শাণ্ডিল্যের নাম ষষ্ঠ থেকে নবম অধ্যায়ে প্রায়ই চোখে পড়ে; এই অংশে যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়াই যায় না। তাই মনে হয়, শাণ্ডিল্যই সম্ভবত ঐ চারটি অধ্যায়ের রচয়িতা ছিলেন। অন্যদিকে যাজ্ঞবল্ক্য বাকি অংশের প্রণেতা। শাণ্ডিল্য রচিত অংশে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভৌগোলিক পটভূমিকা স্পষ্ট, কিন্তু যজ্ঞবল্ক্য রচিত অংশে বিদেহের মতো দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের উল্লেখ লক্ষণীয়। সুতরাং শেষোক্ত অংশ সম্ভবত পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল। তখন লৌহনির্মিত সামগ্রী ও লাঙলের সাহায্যে কৃষিভূমি খনন করে এবং অরণ্যভূমি নির্মূল করে কিছু ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য সম্ভব করা হয়েছিল। সেই যুগে আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছিলেন, অতএব শাণ্ডিল্য রচিত অধ্যায়গুলিই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশ। অন্যদিকে দশম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পরবর্তীকালে বৈদিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক রচিত ও পরে সংযোজিত হয়েছিল। বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও শেষোক্ত অংশকে পরবর্তীকালে রচিত বলে গ্রহণ করা যায়। তখন প্রশাসকররূপে রাজার ভূমিকা সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাগুলির উন্নততর পর্যায় যেমন চোখে পড়ে, তেমনি বৈশ্রাবর্ণের মতো উপদেবতা ও পিশাচ যোনির উল্লেখ থেকেও ঐ অংশের বিলম্বিত আবির্ভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

যথার্থ বৈদিকযুগ সমাপ্ত হওয়ার বহুদিন পরে যখন বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ও বিলয় হয়ে গেছে, সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগে আমরা সামবিধান ও ঋগবিধান ব্রাহ্মণের মতো 'বিধান' ব্রাহ্মণ জাতীয় জাদু-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নানা বিশ্লেষণপূর্ণ বিশেষ এক ধরনের রচনার সন্ধান পাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থে অনুষ্ঠানগুলি যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি সামগীতি ও মন্ত্র আবৃত্তি এখানে জাদুক্রিয়া রূপে বর্ণিত। বস্তুত, যথার্থ বৈদিক অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে এ ধরনের গ্রহে বিপদ নিবারণের আশু উপায়, প্রকৃতি ও সমাজের

অভিসম্পাত, ভাবী অকল্যাণসূচক চিহ্ন, (নিমিত্ত ও 'শকুন' নামে যা পরবর্তীকালে চিহ্নিত) অশুভপ্রদ ও ক্ষতিকারক জাদু, ইত্যাদিই অধিকমাত্রায় বিবৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিতান্ত ক্ষীণ ও বাহ্য; এরা যে 'ব্রাহ্মন' অভিধা আত্মসাৎ করেছে, তার কারণ আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কেই এদের মনোযোগ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তা শুধু আপাতদৃষ্টিতেই।

'আর্যেয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি সূত্র-ঐতিহ্যের অন্তর্গত আরও একটি বিলম্বিত রচনা; কৌথুম শাখার অন্তবর্তী সামবেদের অর্বাচীনতর রচনাগুলির সঙ্গে সূত্র-সাহিত্যের সাযুজ্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর্যেয় নামের মধ্যে যদিও ঋষিদের সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি 'গণ'গুলির বিবিধ নামের তালিকা। মাঝে মাঝে কোনো ঋষিকে তঁর রচনা অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায়ই ঋষির নিজস্ব নামের চেয়ে বিশেষণটি অধিক জনপ্রিয় বলে মনে হয়। এই ব্রাহ্মণে উল্লিখিত গানগুলি পূর্বাচিক ও মহানাম্ন্যার্চিকের অন্তর্গত গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় গীতিসংগ্রহ থেকে উৎকলিত হয়েছে; উত্তরার্চিকের ঊহ ও উহ্যগান। এখানে উদ্ধৃত হয় নি। কীথ অবশ্য 'মন্ত্র' ও আর্যেয় ব্রাহ্মণকে একই গ্রন্থের দুটি অধ্যায় বলে মনে করেন। রচনাশৈলীতে অর্বাচীনতার পরিচয় স্পষ্ট; কালগত অসঙ্গতির অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রাচীনতার ভাণ করে কৃত্রিমভাবে রচনাকালকে পিছিয়ে দেবার কোনো প্রয়াস এখানে দেখা যায় না।

আর্যরা যে আর্যাবর্তে তাদের আদি বাসভূমি থেকে সরে এসেছিল, তার ভৌগোলিক প্রমাণ স্পষ্ট। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাব থেকে তারা পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলের অন্যত্র এসেছেন বলেই সম্ভবত ঐ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রতি যেন কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই ব্রাহ্মণ মগধের নিকটবর্তী পূর্বাঞ্চলের দূরতম কোনো প্রান্তে রচিত হয়েছিল। এই অঞ্চল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তখনো পর্যন্ত বলবৎ থাকলেও পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের

সঙ্গে আর্যদের পারস্পরিক সংমিশ্রণের কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়, বস্তুত এই স্থানীয় অধিবাসীদের বসতির সীমানা এখন আর্যাবর্তের পূর্ব সীমান্তে। আর্যরা যেহেতু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিলেন, পূর্বদিকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশও ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক এই ব্রাহ্মণের অর্বাচীনতার প্রমাণই বহন করছে।

বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদ অনেক বিলম্বে গৃহীত হয়েছিল, তাই তার একটিমাত্র ব্রাহ্মণেই রয়েছে : গোপথ ব্রাহ্মণ। এর বিষয়বস্তু সূত্র সাহিত্যের অধিকতর নিকটবর্তী; কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই গ্রন্থ অথর্ববেদের বৈতান-সূত্র অপেক্ষাও পরবর্তী। এটি যে দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, তাদের মধ্যে পূর্ব ব্রাহ্মণ নামে প্রথম অধ্যায়ের পাঁচটি প্রপাঠক ও উত্তর ব্রাহ্মণ নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছাটি প্রপাঠক। পূর্ব ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু হ'ল সৃষ্টিতত্ব, প্রণব ও গায়ত্রীর অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রহস্য, সূত্রের নিগূঢ় রহস্যময় তাৎপর্য এবং পুরোহিতদের আনুষ্ঠানিক ভোজন। এ ছাড়াও এতে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কেও একটি অংশ রয়েছে। উত্তরব্রাহ্মণে কিছু কিছু প্রধান যজ্ঞ বিবৃত হয়েছে; তবে অথর্ববেদের ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের কর্তব্য ও অধিকার এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে তার অবস্থানই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বর্ণনীয় বস্তু। সমগ্র গ্রন্থের গঠন শিথিল এবং সম্পাদনায় যত্নের অভাব স্পষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রাচীনতর গ্রন্থগুলির অন্যতম; এই গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে আমরা ব্রাহ্মণগুলি রচনার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি, কেননা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হ'ল যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখানে বিভিন্ন দেবকাহিনীর মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে সমস্ত অনুষ্ঠানের চূড়াও লক্ষ্য রূপে খাদ্য উৎপাদনের উপর বিশেষ শুরুত্ব আরোপ এই গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি, গোসম্পদলাভ ও সন্তানলাভকেও যজ্ঞের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে

উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই প্রাচীনতর ব্রাহ্মণেও আমরা পুরোহিতদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং দক্ষিণা গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হতে দেখি। যজ্ঞের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট তাৎপর্য কিছু কিছু নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রায় অন্তহীনভাবে পুনরাবৃত্ত দীর্ঘ গদ্য সূত্র এবং প্রত্যেকটি আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের প্রয়োগকে যুক্তিগ্রাহারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বহু দেরকাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে। এমনকি এই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও সেইসব বৈশিষ্ট্য উপস্থিত যেগুলির প্রভাবে ব্রাহ্ম, গ্রন্থগুলি সাহিত্য হিসাবে সাধারণভাবে অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত বৈশিষ্ট্য হ'ল সংহিতা-বহির্ভুত তাবৎ যজ্ঞসম্পর্কিত—এমনকি যজ্ঞ-বহির্ভূত-ধর্মীয় ও তৎকালীন লোকসমাজ থেকে এই প্রাচীনতম সংকলিত বস্তু এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিতেও আমরা লক্ষ্য করি।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৌষীতকি বা শঙ্খায়ন আবার অর্বাচীনতর। ব্রাহ্মণগুলিব অন্যতম। এই ব্রাহ্মণের রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা স্বচ্ছন্দে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি। যে অসংখ্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় রচিত এই গ্রন্থে যে সমস্ত ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুষীতক বা কৌষীতকি তাদের অন্যতম। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে প্রাথমিক পর্যায়ে ঋগ্বেদের একটিমাত্র ব্রাহ্মণ ছিল; পরবর্তী কালে বিভিন্ন ঋষিপরিবার ও অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দেওয়ায় মূল গ্রন্থটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় গ্রন্থের অভিন্ন একটি উৎস থাকায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উভয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে : দেবতাদের সহগামী যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কে একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে—প্রাচীন মানুষের প্রত্নস্মৃতিতে অগ্নিপ্রজ্বলন সম্পর্কে যে উদ্বেগ, অগ্নিনির্বাপণের যে আতঙ্ক ও ভীতি, এবং যজ্ঞাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তার বোধ সমাজমানসে তখন জাগারুক ছিল, তা-ই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বিবৃত যজ্ঞসমূহ হ'ল অগ্নিহোত্র, দর্শপুর্ণমাস, বহুগৌণ ইষ্টি, চতুর্মাস্য : বৈশ্বদেব, বরুণপ্রবাস, সাকমেধ ও শুণাসীরীয়। পর্যাপ্ত শস্যপ্রাপ্তির জন্যে যথাকলে ঋতুগুলির আবর্তন, স্বাস্থ্য, বরুণের পাশ, পাপ ও ব্যাধি থেকে মুক্তি ইত্যাদির কামনায় এই যজ্ঞগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। এছাড়া, নিম্নলিখিত যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। :–সোমযাগ, দীক্ষণীয় ইষ্টি, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়, আতিথ্য ইষ্টি, অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নিষ্টোম, পশুযাগ, প্রাতরমুবাক, আপোনপত্রীয়, ষোড়শী, জ্যোতিষ্টোম ও গবা ময়ন। বিংশতি থেকে ত্রিংশত অধ্যায় যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়গুলি বর্ণনা করেছে এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত ।

ঐতিরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান বিষয়গুলি স্পষ্টতই গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশ। তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনা যখন শেষ পর্যায়ে, সে সময় কৌষীতকির শেষ অধ্যায়গুলি রচিত হওয়ায় এতে সমস্ত নূতন বিষয় সংকলিত হয়েছিল। বিশেষত, শেষ দশটি অধ্যায় বিশ্লেষণ করে আমরা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিলম্বে আগত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। সংবৎসর সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এখন কালের অতীন্দ্রিয় দ্যোতনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি মৃত্যু সম্পর্কিত অতীন্দ্রিয় ভাবনা এবং নিদানবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা, জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্য রূপে শূদ্রদের সমাজিক অবস্থান, কল্যাণপ্রসূ জাদু ও খাদ্য-উৎপাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, গ্রাবষ্টুৎ শ্রেণীর পুরোহিতের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্ভাবিত দেবকাহিনী, ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অতিপ্রাকৃত স্তরে ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবলহিকা (ধাঁধা) প্রভৃতি কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বিবৃত হয়েছে। গবাময়ন যজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনায় 'পুরুষ'কে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খ, পুরোহিত ও যজমানকে কেন্দ্র করে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকী অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যাকে

যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে পরবর্তী তন্ত্রসাহিত্য ও আরণ্যকের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। তবে সর্বাধিক প্রযুক্ত ও প্রাধান্যযুক্ত প্রতীকায়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, কেননা বাস্তবজীবনের সবচেয়ে জরুরি সমস্যারূপে একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থাই ফসল, গোসম্পদ ও সন্তানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ও দ্রুতবৃদ্ধির আশ্বাস আনত। এই উৎস থেকেই ক্রমে সমস্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল।

সামবেদের আটটি প্রধান ব্রাহ্মণেব মধ্যে পঞ্চবিংশ বা তাণ্ডামহাব্রাহ্মণ দীর্ঘতম ও সর্বাধিক পরিচিত। একাহ যজ্ঞ থেকে স্পষ্টতই প্রত্নপৌবাণিক সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ পর্যন্ত সোমব্যাগের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন ও মহাব্রিতের মতো প্রধান যজ্ঞগুলি আলোচিত হলেও সামমন্ত্রের উৎস ও নিগূঢ় রহস্য, মন্ত্রগানের যথার্থ পদ্ধতি ও তৎপ্রসূত পুণ্যফলেব উপবই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের অনুবৃত্তি রূপে পরিচিত ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ অবশ্য প্রধান সোমযাগগুলিকে বিবৃত করেনি, আপাতদৃষ্টিতে তা'-এর সম্পূর্বক ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। এতে মূলত গৌণ অনুষ্ঠানগুলি আলোচিত হয়েছে। এতে কিছু অংশ আছে, যেগুলির সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক নিতান্ত পরোক্ষ। শেষ অধ্যাযে স্বাহা, স্বধা ও বিষট্র উচ্চারণের বিধি প্রভৃতি আলোচিত হযেছে; প্রকৃতপক্ষে এই অংশটি ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট এবং অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামে পবিচিত। প্রকৃতপক্ষে তা' ষড়বিংশবই ষষ্ঠ অধ্যায়। মানুষের জীবনে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও অলৌকিক দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে, এতে তার প্রায় সমস্ত দিকই উপস্থাপিত। এই সঙ্গে অবশ্য প্রতিষেধমূলক অনুষ্ঠানগুলিও আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই গ্রন্থটি বহু পরবর্তীকালের রচনা, যখন প্রতিমাপূজা ও দেবমন্দির নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে তখনকার বৈদিক ঐতিহ্যকে

কৃত্রিমভাবে বেদোত্তর পৌরাণিক ধর্মভাবনা পর্যন্ত প্রসারিত করবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, এই গ্রন্থে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।

গুরুত্ব বিচারের দিক দিয়ে এর পরেই আমরা সামবিধান ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করতে পারি, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে স্পষ্টই বোঝা যায়যে, তা আরও পরবর্তীকালের রচনা। যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে এর প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির প্রতি গ্রন্থটি অধিক মনোযোগী। যদিও গ্রন্থে সূচনায় রহস্যপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণী সামবেদকে আশ্রয় করেই জীবনধারণ করে এবং সাতটি সাঙ্গীতিক সুরপ্রবাহে সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত। কিছু পরেই কয়েকটি পার্থিব বিষয় সম্পর্কেই গ্রন্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে; যেমন উত্তম পত্নী লাভ, পিশাচ ও রাক্ষসদের উৎপাত শান্ত করা, মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি, পুনর্জন্মনিবৃত্তি ইত্যাদি। পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এবং নানাবিধ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ নিবারণের জন্যে কিংবা ঐতিহ্যগত ধর্মাচরণের অভ্যাসে যে সমস্ত অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য বৃত্তবহির্ভূত ও ব্রাহ্মণ্যযুগের পরবর্তী উপাদানসমূহের প্রভাব স্পষ্ট।

শাব্দিক ব্যুৎপত্তি ও সামমন্ত্রের উৎস বিষয়ক কিছু কিছু রচনায় সামবেদীয় ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। 'আর্ষেয়' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থে সামমন্ত্রের ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত সামবেদীয় ঋষিদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। এই তাৎপর্যহীন রচনার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এতে বলা হয়েছে যে, এই ঋষিদের সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে সামগান থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

'দেবতাধ্যায়' নামক অন্য একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেবনাম (অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, সোম, বরুণ, তুষ্টা, পূষণ ও সরস্বতী) এবং সামমন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের

পারিভাষিক নাম বিবৃত হয়েছে। আটটি প্রধান ছন্দের প্রতি তদুপযোগী বর্ণ যোজনা-প্রসঙ্গে অতীন্দ্রিয় বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। গায়ন্ত্রীই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছন্দরূপে এখানে প্রশংসিত; ছন্দনামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে যাস্কের অনুসরণ স্পষ্ট।

'বংশ' ব্রাহ্মণ নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে সামবেদের বিভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠাতাদের যেসব নাম বিবৃত হয়েছে, তাদের সূচনায় ব্রহ্মা ও সমাপ্তিতে সর্বদত্ত। এই ব্যাপক তালিকা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি বহু পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল।

সামবেদের অন্যতম প্রধান ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য দশটি প্রপাঠকে বিন্যস্ত। প্রথম দুটি অধ্যায়ে গৃহ্য অনুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ আলোচিত হয়েছিল বলে এই অংশকে মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপর্বরূপে অভিহিত করা হয়। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরই আলোচনা। যথা-বিবাহ অনুষ্ঠান, নবজাতকের জাতকর্ম, সাপের প্রতি অর্ঘ্য, স্নাতক শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান, পিতৃপুরুষদের প্রতি নিবেদিত অনুষ্ঠান, গৃহপ্রতিষ্ঠা, নবনির্মিত গৃহে আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ, কৃমিরোগ নিরাময় ইত্যাদি। গোভিল ও খাদির গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে এই ব্রাহ্মণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, কেননা সম্ভবত এই দুটি গ্রন্থ

এর প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশটি প্রপাঠকের মধ্যে একমাত্র প্রথম দুটিতেই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। তৃতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায়ে যে সব গৌণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ এই উভয়েরই চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্তমান। স্পষ্টতই এই গ্রন্থটি বহু পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল,

যখন খুব কম লোকই যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারত। অনুষ্ঠানের তখন এত বেশি যান্ত্রিকতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ধর্মাচারের প্রধান প্রবণতা তখন আনুষ্ঠানিকতা থেকে দ্রুত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। গ্রন্থের শেষ তিনটি অধ্যায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সন্ধান পাই।

সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণের নামটি খুবই কৌতূহলজনক, যেহেতু নামকরণের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারাই–সংহিতা, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ-উল্লিখিত হয়েছে এবং উপনিষদ স্থান পেয়েছে ব্রাহ্মণের আগে। প্রকৃতপক্ষে এটি পরবর্তীকালে রচিত; বিষয়বস্তুর বিন্যাসে সর্বাত্মক হওয়ার প্রবণতা এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমটিতে সমস্ত সংহিতাকে দেবতা, দানব ও ঋষিদের অনুষঙ্গ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রকৃতপক্ষে সামগানের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ সংক্রান্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও স্বরন্যাসের ক্ষেত্রে সামগানের প্রযোজ্য পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে আচার্যের উদ্দেশে প্রদত্ত গুরুদক্ষিণার আলোচনা আছে।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে; এতে মুখ্যত যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগায়ক ছান্দোগ্য পুরোহিতদের কর্তব্য। প্রথম অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র ও প্রায়শ্চিত্ত সহ অগ্নিষ্টোম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবাময়ন ও সোমযাগের কয়েকটি শাখা বিবৃত হয়েছে।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ একটি অর্বাচীন রচনা, প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন সামমন্ত্রের নাম, দ্বিতীয় ঋষিদের নাম, তৃতীয়ে বিখ্যাত সাম গায়কদের তালিকা এবং চতুর্থে যক্ষ্মারোগ থেকে আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা, উদগাতা শ্রেণীর পুরোহিতদের কর্তব্য এবং সামবেদীয় আচার্য ও

প্রধান গায়কদের তালিকা বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের শেষতম অংশই হ'ল কোনোপণিষদ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে একমাত্র তৈত্তিরীয় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এই গ্রন্থের তিনটি অষ্টকের উপবিভাগরূপে কয়েকটি প্রপাঠক কল্পিত হয়েছে, যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণরূপে তা প্রাথমিকভাবে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও প্রসঙ্গত মন্ত্রগুলির আলোচনা করেছে। এই গ্রন্থে সোমাযাগের সমস্ত প্রধান রূপই ব্যাখাত হয়েছে : সৌত্রিমণী, রাজসূয়, বাজপেয়, চাতুর্মস্য, অগ্নিহোত্র, দর্শপুর্ণমাস, ইষ্টি, পুরুষমেধ, পশুযাগ ও অশ্বমেধ। এই গ্রন্থের মধ্যে যেহেতু বহুপরবর্তী যজ্ঞানুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহও ব্যক্ত হয়েছে, তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকে বিকৃত করার প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সেই যুগেই রচনা। বর্ণনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে আমরা অনায়াসে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকে এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে পরিপূর্ণতম ও ব্যাপকতম বলে গ্রহণ করতে পারি। তবে, বিপুল ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিন্যাসে যথেষ্ট শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়ে বলে আমাদের অনুমান এই যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বিভিন্ন যজুর্বেদীয় পুরোহিত শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের দ্বারা অসতর্ক ও শিথিলভাবে রচিত ও সম্পাদিত হয়েছিল। যজ্ঞানুষ্ঠান তখন ক্রমশ জটিলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আনুষ্ঠানিক উপাদান ও দেবকাহিনী উদ্ভাবিত হয়ে পুরোহিতসমাজের দ্বারা যজ্ঞশাস্ত্রে সমর্থিত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা ও পুরোহিতদের ক্রমবর্ধমান শাখাগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল, বস্তুত, যাবতীয় ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণই এখনও পাওয়া যায়; এই গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যন্দিন শাখায় ছটি কাণ্ডে বিন্যস্ত একশত অধ্যায়ের জন্যই গ্রন্থের এই নামকরণ। বিভিন্ন কাণ্ডের বিষয়বস্তু হল : দর্শপুর্ণমাস (১ম), অগ্ন্যাধান, অগ্নিপুনঃপ্রজ্বলন অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃ যজ্ঞ, আগ্রায়ণেষ্টি, দীক্ষায়ণ ও চতুর্মাস্য (২য়); সোমযাগ, দীক্ষা ও অভিষব (৩য়); ত্রিষবণ, সোমযাগের বিভিন্নরূপ : দ্বাদশাহ, ত্রিরাত্র ও অহীনের জন্য দক্ষিণা এবং সত্র (৪র্থ), রাজসূয় ও বাজপেয় (৫ম), উখা, বিষ্ণুর ত্রিপাদবিক্রম, বাৎমপ্র ও উপাধান (৬ষ্ঠ)।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতো শতপথ ব্রাহ্মণেও যথার্থ সম্পাদনার অভাব লক্ষণীয়। রচয়িতারূপে যদিও যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তবু মনে হয় তে, গ্রন্থের বিপুল অংশ রচনা করে থাকলেও সমগ্র ব্রাহ্মণ তিনি প্রণয়ন করেন নি, কেননা গ্রন্থের কোনো কোনো স্থানে (মোট তেইশবার) তাকেই প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ বা বিতর্কে যোগদানকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্রাহ্মণের বহু স্থানে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে সুস্পষ্ট বিভেদ অভিব্যক্ত হয়েছে, তাতেও একাধিক লেখকের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়াও বিশেষজ্ঞ রূপে শাণ্ডিল্য ও তুর কাবসেয় উল্লিখিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে জনমেজয়ের অভিষেক 'তুর' প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এই জনমেজয় যদি মহাভারতের চরিত্র হয়ে থাকেন, তাহলে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। বিভিন্ন তাত্তিক বিতর্কে আমরা শৌচেয়/প্রাচীনযোগ্য, উদ্দালক, আরুণি, শ্বেতকেতু এবং বিদেহরাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজা জনককে অংশগ্রহণ করতে দেখি, এবং লক্ষণীয় প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই যজ্ঞবিষয়ক বিতর্ক উপসংহারে আধ্যাত্মিক ভাবনার পর্যবসিত হয়েছে।

অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণগুলিয় অন্যতম শতপথ বিশেষভাবে মূল্যবান হওয়ার কারণ হল, এই গ্রন্থ বহু দেবকাহিনীর সংকলন হওয়া ছাড়াও আমাদের কাছে ইতিহাস ও ভূগোলের উপাদানসম্বলিত সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ এই চিত্র উপস্থাপিত করেছে। শুধু তাই নয়, একে আমরা

অধ্যাত্মবাদী সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও দার্শনিক পরিশীলনের আকর-গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করতে পারি। -শেষোক্ত উপাদান অন্তিম অধ্যায়ে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ অর্বাচীনতর রচনাগুলির অন্যতম। বৈদিক সাহিত্যের অংশরূপে অথর্ববেদের স্বীকৃতিলাভের পরেই তার নিজস্ব একটি ব্রাহ্মণ গ্রহের অনিবার্য প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, ফলে গোপথ ব্রাহ্মণ রচিত হল। দুটি ভাবে বিভক্ত এই গ্রন্থের পূর্বভাগে পাঁচটি অধ্যায় ও উত্তরভাগে ছটি অধ্যায়। পূর্বভাগের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান এবং 'ওম' ও অন্যান্য রহস্যগূঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি, মৌদ্গল্য ও গালিবের একটি দীর্ঘ বিতর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, পঞ্চবিধ অগ্নি, পুরোহিতদের যোগ্যতা, ব্রাহ্মণদের খাদ্য, আত্রেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং বৈশ্বানর ও সপ্তপন জাতীয় অগ্নির উৎস বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অথর্ববেদীয় ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও কয়েকটি প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান, পুরোহিতদের কর্তব্য ও তার প্রাপ্য দক্ষিণা, অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, ঋত্বিকনিয়োগ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আলোচনা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঋত্বিক নিয়োগ অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ প্রধান পুরোহিত ও তাদের সহকারী, বর্ষের উৎপত্তি এবং দশারাত্র, মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ বিবৃত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে নানা বিভিন্ন বিষয়বস্তু।

উত্তরভাগের প্রথম অধ্যায়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে বরুণ প্রঘাস এবং পিতৃমেধ যজ্ঞ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাংস অর্ঘ্য, উপসন্দবিষয়ক দেবকাহিনী, দেবপত্নী, সোমপানের প্রশংসা, প্রত্নকথার মাধ্যমে কর্তব্যে শিথিলতার পাপক্ষালন, প্রজাপতির স্তোত্র ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিষটি উচ্চারণের বিধি এবং যজ্ঞদক্ষিণার বিভিন্ন উপকরণ ছাড়াও ব্যবটু

উচ্চারণকে বীজ ও ষড়ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবতাদের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রযোজ্য মন্ত্র, দক্ষিণা, বেদী, পুরোডাশ, ত্রিষবাণ, দেবাসুর যুদ্ধ, পঞ্চপ্রাণ, উকথা ও ষোড়শী যাগ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শর্বরী শব্দের নির্বচন, রাত্রি সম্পর্কিত আটটি সূক্ত, সোমপান ও তৎসংশ্লিষ্ট সামগান, বাজপেয়, সোমব্যাগের প্রাথমিক ও গৌণ অংশ আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রগাথ, অহীন, নারাশংস, বালখিল্য, বৃহতী এবং এগুলির উপযোগী দেবকাহিনী প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে।

গোপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক বিচ্যুতি ও সংশোধন সম্পর্কে প্রায়ই যে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় তা অথর্ববেদের ব্রহ্মা শ্রেণীর পুরোহিতের নির্দিষ্ট কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, এতে যে বিচিত্র বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে সেসব গোপথ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনিবার্যই ছিল। অথর্ববেদ সংহিতার মধ্যে যদিও বহু প্রাচীন উপাদান রয়েছে, গোপথ ব্রাহ্মণ পরিকল্পিতভাবে রচিত হয়েছিল ব'লেই প্রচলিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ঐতিহ্যকে তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছে। এই গ্রন্থে যেহেতু দীক্ষানুষ্ঠানের দেবীরূপে 'শ্রদ্ধা'কে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং ভাষার মধ্যে উপনিষদের সংলগ্নতা সুস্পষ্ট, তবুও একে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অন্তিম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়। অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ, প্রয়োগ ও ক্রিয়ার মধ্যবর্তী অসামঞ্জস্যকে যেভাবে রূপক নির্মাণ বা ছন্দ প্রতীকায়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এবং ব্যাকরণকে পৃথক বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা' থেকেও রচনাকালের পরবর্তিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সাধারণ ধারার সঙ্গে গোপথের পার্থক্য এখানেই যে যথার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুব কম; সে তুলনায় প্রতিবাদপ্রবণ ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এবং দেবকাহিনীর সাহায্যে অর্থবাদ

অংশের অবতারণাই এখানে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কখনো কখনো এই গ্রন্থে অথর্ববেদের শ্রেষ্ঠত্বও ঘোষিত হয়েছে; বস্তুত, এতে যেন সমাজের দীর্ঘ অবহেলার বিরুদ্ধে অথর্ববেদের বিলম্বিত ও সচেতন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই গ্রন্থের আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচনা। এ বেদটির উৎস যে লঘু ঐতিহ্যের মধ্যে, যার জন্যে বৃহৎ ঐতিহ্যের 'ত্রয়ী'-এর প্রতি দীর্ঘকাল পরম অবজ্ঞা পোষণ করেছে, তাও এই গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার প্রতিবিধানের অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রমাণিত।

পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে অথর্ববেদের নিবিড় সম্পর্কই এতে প্রমাণিত হচ্ছে। উল্লেখ করা যায় যে, অথর্ববেদ সংহিতার মতো গোপথ ব্রাহ্মণও ভৃগু ও অঙ্গিরার সঙ্গে আপনি সম্পর্ক ঘোষণা করেছে।

অথর্বপরিশিষ্টের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, প্রচলিত গোপথ ব্রাহ্মণটি বিশালতর কোনো একটি রচনার অন্তিম অবশেষ, এই জন্যেই একে 'অনুব্রাহ্মণ' বলা হয়ে থাকে। সাধারণত অন্য ব্রাহ্মণগুলি যে সমস্ত লোকায়ত ও গার্হস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি, অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই ব্রাহ্মণে সেইসব বিষয়ও ব্যাখ্যাত হয়েছে; যেমন-সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণ। 'ব্রহ্মা' শ্রেণীর পুরোহিতের উচ্চ প্রশংসা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাত্যদের বিশিষ্ট উল্লেখ, অথর্ব ও অঙ্গিরার ভূমিকার গৌরবকীর্তন, অবৈদিক প্রাগার্য ও যোগী ঐতিহ্যের উপাদান সম্বলিত দেবকাহিনী ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অথর্ববেদের ব্রাহ্মণরূপে গোপথের মুখ্য প্রবণতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। লক্ষণীয় যে, এই ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুর অনুষ্ঠানগত তাৎপর্যক্রমবিবর্তনের পথে আধ্যাত্মিক ও অতিজাগতিক স্তরে নিবিষ্ট হয়ে,

পরবর্তী যুগে রচিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অথর্ববেদীয় উপনিষদগুলির পূর্বাভাস সূচিত করেছে।

গৌণরচনা (ব্রাহ্মণ)

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে : বিধি ও অর্থবাদ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে বহু গৌণ বর্গ রয়েছে, যেমন ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা, আখ্যান, নারাশংসী ও বাকোবাক্য। এই তালিকা থেকে আমরা তৎকালে প্রচলিত বিচিত্র সাহিত্যবর্গগুলি সম্পর্কে যেমন অবহিত হই, তেমনি তাদের ধারকরীপে প্রাচীন গদ্যভঙ্গির স্থিতিস্থাপকতারও পরিচয় পাই। এই তালিকাতে বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী বা বিধিকে প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত করার জন্যেই লোকায়ত সাহিত্য বর্গগুলির উদ্ভব ও চর্চা হয়েছিল। আখ্যান ও প্রশস্তি কাব্যের মতো সাহিত্যগুলির ভিত্তি যে জনপ্রিয় ছিল, তা তৈক্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি বক্তব্যে স্পষ্ট। সেখানে বলা হয়েছে যে, বেদের অশুদ্ধ অংশই গাথা ও নারাশংসীতে পরিণত হয়েছিল। বর্ষব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞে অধ্বর্যু দ্বারা আমন্ত্রিত হোতা 'পারিপ্লব' আখ্যান নামে যে সব কাহিনী শোনাতেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যজমান রাজাকে উন্নততর নৈতিক স্তরে উত্তীর্ণ করে দেওয়া, কিন্তু অতি দীর্ঘায়িত পুনরুক্তিবহুল এই কাহিনীগুলির নিজস্ব গৌরব খুব বেশি ছিল না–সম্ভবত প্রাচীন সমাজ অধুনাবিস্মৃত বিশেষ কোনো কারণেই এদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করত।

আঙ্গিক ও ভাষা (ব্রাহ্মণ)

ব্রাহ্মণগুলি সংস্কৃতে গদ্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন; গদ্য অংশযুক্ত কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন ধারার অন্তর্গত বলেই ব্রাহ্মণ সাহিত্যকে গণ্য করা চলে। গান বা আবৃত্তির যোগ্য স্তবকের মতো গদ্যসাহিত্যের কোনো সৃজনশীল প্রেরণার দাবি ছিল না। তবুও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করত; গদ্য ব্যাখ্যা ও অর্থবাদের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানকে এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যই বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্দেশ সূচনা ও ব্যাখ্যা এর গদ্যভঙ্গির চরিত্র নির্ধারণ করেছিল। মৌখিক রচনারূপে এই গদ্যের কিছু কিছু বিশেষ সমস্যা ছিল, কেননা এই বিপুল সাহিত্যকে কণ্ঠস্থ করে সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিতেই ধারণ করতে হত, অথচ ছন্দের সাহায্য ছাড়া এই বিপুল সাহিত্যসম্ভারকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল।

ব্রাহ্মণসাহিত্য তিনভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছিল। প্রথমত, এর রচনাশৈলীর মৌল লক্ষণ হ'ল বাকসংযম বা সংক্ষিপ্ততা এবং যথাযথতা; প্রায় কোথাও কোনো একটিও অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যবন্ধ পাওয়া যায় না এবং সেই সঙ্গে সমাস ও সংকুচিত বাক্যাংশের প্রয়োগ এবং খণ্ডবাক্যকে শব্দে পরিণত করার প্রবণতার ফলে গ্রন্থের আয়তন বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হত। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গদ্য ছন্দোবদ্ধ হওয়াতে ছন্দের দ্বারা কণ্ঠস্থ রাখার সুবিধা হত। তৃতীয়ত, রচনাশৈলী সংহিতার মতোই সাংকেতিক সূত্র জাতীয়। এই সব সূত্র চরিত্রগতভাবে ভিন্ন; তাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি, সুপরিনির্দিষ্ট বিশেষণ, নিশ্চিত অবস্থানে শব্দের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। মুহুর্মুহু পুনরাবৃত্তির ফলে গদ্য শৈলী অতিরিক্ত মাত্রায় ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে; একই ধরনের খণ্ডবাক্য ও শব্দবন্ধের পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ প্রায় অন্তহীনভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় রচনাশৈলী প্রচণ্ডভাবে ভারপ্রস্তু। অন্যদিকে বিষয়বস্তু তার অন্তর্নিহিত যজ্ঞকেন্দ্রিক প্রকৃতির ফলেই অনাকর্ষণীয়। এই একঘেয়েমি এত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত যে কেবলমাত্র

বিষয়বস্তুর অসামান্য ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যেই ব্রাহ্মণসাহিত্য আজও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় নি। কখনো কখনো একই উপসর্গ বা প্রত্যয় বিভিন্ন শব্দে প্রযুক্ত হয়েছে, এগুলি একই সঙ্গে স্মৃতি-সহায়ক ও শ্রোতা ও বক্তার কল্পনায় ঐন্দ্রজালিক শক্তির উদ্বোধিক। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দুটি সম্পূর্ণ স্তবকে 'গ্রহ' শব্দ ভিন্ন দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মূলত যে-শব্দটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে এখানে অনুষ্ঠানবহির্ভূত একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। স্পষ্টতই এই প্রবণতা অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক অতীন্দ্রিয়বাদ ও প্রতীকায়নের মধ্যে দিয়ে আরণ্যকের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে উর্ধগামী বা নিম্নগামী সুর প্রবাহে বিন্যস্ত বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের বিন্যাস কিংবা পরিমাণগত সমতারক্ষা প্রকৃতপক্ষে শ্বাসাঘাত বা পুনরাবৃত্তির মতোই স্মৃতিসহায়ক। কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তির দ্বারা আমরা সূত্রের মধ্যে স্বরপ্রবাহের ধারণা-সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত একটি কৌশলের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। সংহিতায় নিহিত নিয়মিত ছন্দের পরিগঠনে যে অভাব তা অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরসূরীরূপে ব্রাহ্মণের আঙ্গিকেও দেখা যায়–কিঞ্চিৎ পরিমাণে তারই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা ঐ উপাদানগুলির একত্র সন্নিবেশে লক্ষণীয়।

কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি রচনার বিশেষ প্রবণতা ব্রাহ্মণসাহিত্যে রয়েছে। ব্যুৎপত্তির প্রতি এই আগ্রহ স্পষ্টতই আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যক্ত, যেহেতু যজ্ঞানুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল। তাই "উদগীথকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্যে জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে শব্দটির তিনটি অংশের ব্যুৎপত্তি নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শিত হয়েছে : উদ = আদিত্য, গী = অগ্নি এবং থ = চন্দ্র। কোনো সন্দেহ নেই যে, এজাতীয় সম্পর্ক কল্পনার যৌক্তিকতা প্রমাণের উপযোগী রচনা কোথাও নেই। কখনো কখনো এধরনের ব্যুৎপত্তিকে সমর্থন করার জন্যে কিছু কিছু দেবকাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে; সেসব বর্তমানে

আমাদের কাছে হাস্যকর বলে প্রতিভাত হলেও তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এসবই বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলত। ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি জনমানসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির বিস্ফোরিত (শো ধাতু বিস্ফার অর্থে) চোখ থেকে 'অশ্বে'র উৎপত্তি, বা 'অঙ্গ' ও 'রস' থেকে অঙ্গিরস বা অঙ্গিরার নিরুক্তি প্রদত্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে শতপথ ব্রাহ্মণে অঙ্গের থেকে অঙ্গিরসের ব্যুৎপত্তি কথিত হয়েছে, তাই ব্রাহ্মণসাহিত্যপ্রদত্ত নিরুক্তিগুলি পরস্পর বিসদৃশ, যদিও প্রবহমান বিপুল সাধারণ উৎস থেকেই পুরোহিতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের উপাদান সংগ্রহ করতেন। কখনো কখনো বর্ণনীয় বিষয়ের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে বিকল্প ব্যুৎপত্তি উপস্থাপিত হত। কখনো বা অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে সমর্থন করার জন্যে নানাবিধ ব্যুৎপত্তি প্রবর্তিত হত। গোপথ ব্রাহ্মণে 'পুত্র' শব্দের নিরুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে পুল্লাম নরক থেকে ত্রাণ করে সে-ই পুত্র। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানই যেহেতু সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করত, তাই পুত্রলাভের পুণ্য সামাজিক মূল্যবোধেরই ইঙ্গিত বহন করে–সেই সঙ্গে পুন্নামক নরকের আবিষ্কারও এই মূল্যবোধেরই স্বীকৃতি। আবার, 'উপবাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যে পবিত্রতার দ্যোতনা রয়েছে, তাতে মনে হয়, এটা তখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কেননা, উপবাসের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্য সম্ভবত প্রাক্তন পশুপালক সমাজে নূতন প্রবর্তিত হয়েছিল, যখন যজ্ঞানুষ্ঠান আর এ জাতীয় আত্মনিগ্রহ দাবি করতে পারত না। তেমনি 'উপনিষদ' শব্দটি 'নিষদ' বা আনুষ্ঠানিক দীক্ষা থেকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। স্পষ্টতই এটা হ'ল উদীয়মান ভাবনাত্মক যজ্ঞবিরোধী ঔপনিষদীয় প্রবণতার অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মাণ্য ঐতিহ্যের সমন্বয়ের নিদর্শন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইন্দ্র সম্পর্কে ত্রিধাতুশরণম্য বিশেষণটি প্রয়োগ করেছে-এই শব্দে স্পষ্টতই বৌদ্ধ শব্দবন্ধের

পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে; ত্রিধাতু এবং ‘শরণ’ বৌদ্ধ সাহিত্যে, দর্শনে কেন্দ্রীয় এবং বহুব্যবহৃত ।

ব্রাহ্মণের রচয়িতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জাতীয় ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কাল্পনিক; তাই এ’ধরনের প্রয়াসের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য তারা বহুস্থানে লিখেছিলেন ‘রহস্যই দেবতাদের প্রিয়, অতিস্পষ্টকে তারা অবজ্ঞা করে থাকেন।’ [‘পরোক্ষপ্রিয়া বৈ দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষঃ]। সমগ্র পৃথিবীতে প্রাচীন পুরোহিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে দুর্জেয়িতা বা রহস্যসৃষ্টির প্রবণতা, রয়েছে। এ যেন তারই অভিব্যক্তি; কেননা পুরোহিতরা অনুভব করেছিলেন যে এ ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতার পেছনে দেবকাহিনী, প্রত্নকথা নির্মাণের যে প্রয়াস সক্রিয়, তা’ মূলত অবচেতনাপ্রসূত বলেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পুরোহিততান্ত্রিক সমাজের প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ কয়রি প্রচেষ্টা এতে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণে প্রতিফলিত ব্যাকরণ ‘পাণিনি পূর্ববতী’ যুগের ইঙ্গিত বহন করে; বহুশব্দেই বিভক্তি তখনও নির্দিষ্ট নয়। ক্রিয়াপদ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে উপসর্গ প্রয়োগের প্রবণতা সাধারণভাবে বিরলতর হয়ে গেলেও কখনো কখনো সংহিতা যুগের প্রাচীন অভ্যাস আমরা পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। পাণিনির নিয়মবহির্ভূত প্রয়োগ ছাড়াও ইতিমধ্যে আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তাৎপর্যগত স্পষ্ট পার্থক্য অভিব্যক্তি হয়েছে। ব্রাহ্মণের শব্দভাণ্ডারে আর্যদের কালানুক্রমিক ও ভৌগোলিক অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে। অনার্য উৎস-জাত বহু অপরিচিত বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদকে সম্পূর্ণ অপরিশীলিত ও সামান্য পরিশীলিত অবস্থায় ভারতীয় আর্যভাষা আত্মসাৎ করেছে। পাণিনির সমসাময়িক গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে সর্বপ্রথম অব্যয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখানে তির্যক রচনাশৈলীর জন্য সংলাপগুলি অধিকতর প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণের রচনাশৈলীতে যে চমৎকার অব্যবহিত প্রত্যক্ষতা, শক্তিমত্তা, সংক্ষিপ্ততা ও সংকোচনশীলতা অভিব্যক্ত হয়েছে, তা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পূর্বে বা পরে আর কখনো এমন

যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি, যেহেতু অনুরূপ রচনাশৈলীযুক্ত সূত্র-সাহিত্যের কোনো সাহিত্যগুণ নেই, কিন্তু কাব্য সৌন্দর্যযুক্ত বহু স্তবক ব্রাহ্মণসাহিত্যে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রায়ই ধ্বনি সংকোচনের প্রয়োজনে প্রয়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্ধি ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রুতিসাহিত্য স্মৃতি সহায়ক হওয়ার জন্যেই সন্ধির ফলে প্রায়ই ধবনিগত কর্কশতা অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনতর। শব্দ একদিকে যেমন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে এসেছে, তেমনিই বেশ কিছু নতুন শব্দও আবির্ভূত হয়েছে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীনতর নাটক ও শিলালিপিগুলিতে সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রচনায় ব্রাহ্মণের ব্যাকরণবিধিই অনুসৃত হয়েছিল। সবগুলি ব্রাহ্মণেই আমরা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি অভিনব উৎসাহ অভিব্যক্ত হতে দেখি। বিজয়ী আর্যজাতি যে নিজেদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সগর্ব ও সচেতন, তার বহু নিদর্শন এ সাহিত্যে পাওয়া যায়। অবশ্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তারের পর্যায়ে বৈদিক ভাষায় অনার্য উৎসজাত ধবনিতাত্ত্বিক প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এমন কিছু প্রহেলিকার সন্ধান পাওয়া যায় যাদের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। পদ্যে নিবদ্ধ ও সাধারণভাবে অনুষ্টুপ ছন্দে প্রথিত, এই প্রহেলিকাগুলিকে 'আজিজ্ঞাসেন্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথর্ববেদের প্রহেলিকাগুলি প্রতিরোধ, অতিবাদ ও অহনয়া নামে পরিচিত। বিভিন্ন ব্রাহ্মণে সার্বভৌম সত্য সম্পর্কে বেশ কিছু শ্লোক রয়েছে যা সাধারণভাবে অনুইপ ছন্দে প্রথিত। প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগুলির অন্যতম ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে প্রচুরসংখ্যক শ্লোক রয়েছে সেগুলিও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ; সম্ভবত সংহিতার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরসূরীরূপে এদের গণ্য করা চলে। প্রাচীন মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিফলন হওয়া ছাড়াও এগুলির

মধ্যে আমরা বহু প্রাচীন উপকথার সন্ধান পাই। অন্যান্য ব্রাহ্মণে এ ধরনের শ্লোককে ইন্দো-ইরাণীয় যুগের ঐতিহ্য অনুযায়ী 'গাথা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুষ্টুপ ছন্দে এবং কখনো ত্রিষ্টুপ ছন্দোও প্রথিত গাথাগুলির বহুস্থানেই প্রকৃত কাব্যিক সৌন্দর্য ও প্রাচীন লোকায়ত উপলব্ধির সজীব অভিব্যক্তি ঘটেছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এ ধরনের রচনায় আলংকারিক রচনাশৈলীর আভাস থাকলেও তা সর্বত্র কাব্যিক গুণের পরিচায়ক নয়, যেহেতু ব্রাহ্মণের অভীষ্ট হ'ল ঋজুতা, স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুত অর্থবোধ। প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় চিত্রকল্পের প্রয়োগেও নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপমা ও রূপক প্রযুক্ত হলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে যথাযথ ও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ কোথাও কোথাও রচয়িতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে কোনো গভীর উপলব্ধি বা প্রাকৃত কাব্যিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে নি।

দেবকাহিনী

বৈদিকসমাজের ধর্মীয় চেতনার শুরুত্বপূর্ণ স্তর যে সব দেবকাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেসব ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রথম ও শেষবারের মতো বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এইগুলিই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রাণ, যার মধ্যে তৎকালীন ধর্মীয় জীবনেব। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিস্তারিত ও জটিল যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা দের্শিত হয়েছিল এবং কালক্রমে তা-ই একটি সামগ্রিক সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। দেবকাহিনীগুলিকে ছ'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) ধর্মতত্ত্বমূলক–এতে দেবতাদের উৎস, স্বভাব, কার্যকলাপ, সম্পর্ক ও বীরত্ব বিষয়ক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। (২) আনুষ্ঠানিক–এজাতীয় প্রন্নকথায় আনুষ্ঠানিক কর্ম, ক্রিয়াকাণ্ডের কাল, পদ্ধতি,

স্থান, বিধিনির্দেশ-পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি কাহিনীর রূপকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। (৩) সামাজিক ও নৈতিক–এতে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস, নিয়ম, সংস্কাব ও কার্যকলাপের যৌক্তিকতা কাহিনীর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। (৪) সৃষ্টিতত্ত্বমূলক ও হেতুসন্ধানী– এ জাতীয় কাহিনীতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী বা কিছু কিছু গৌণ সৃষ্টির উৎস আলোচিত হয়। (৫) নৈসর্গিক–এতে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি দেবকাহিনীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। (৬) আধ্যাত্মিক–এখানে মানুষ ও বিশ্বজগতের মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃত ও আদর্শ সম্পর্কের উপরে আলোকপাত করা হয়।

ধর্মতত্ত্বমূলক কাহিনীগুলি সমগ্র সমাজের সামূহিক উত্তরাধিকারূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের কিছুকাল পরে ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এজাতীয় কাহিনীকে বিস্তৃত রূপ দিয়েছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশ জটিলতর হওয়ার ফলে এদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ও অনুমোদনের জন্য নূতনতর দেবকথার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অবশ্য আনুষ্ঠানিক কারণ ছাড়াও, এসব দেবকথা দেবতাদের সম্পর্কেও আলোকসম্পাত করে। বহু ক্ষেত্রেই এগুলির মধ্যে আমরা দেবতাদের প্রকৃত পরিচয় বিষয়ে তথ্য পাই। একটি বহুপ্রচলিত দেবকথার রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতির দেহভেদ বর্ণিত হয়েছে : প্রজাপতি স্বীয় কন্যার প্রতি কামনাসক্ত হয়েছিলেন বলে রুদ্র প্রজাপতিকে আঘাত করতে সম্মত হয়েছিলেন পশুদের উপর একাধিপত্যের বিনিময়ে। কোনো প্রাগ্বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে পশুজগতের সম্পর্ক সম্ভবত আর্যদের ভারত আগমন অপেক্ষা প্রাচীনতর সিন্ধু উপত্যকার প্রত্ন পশুপতি শিবের সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রুদ্রদেবের সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়েই আর্যদের নূতন এই দেবকাহিনীটি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, যেহেতু তা' না হলে সম্পূর্ণত আর্যদেবরূপে পশুপতির প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল।

সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারবার প্রজাপতিকে প্রাণশক্তির সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। এমনকি শেষপর্যন্ত তিনি নবজাত বর্ধিষ্ণু শিশুর প্রতিকল্প হয়ে ওঠেন। প্রাণশক্তিরূপে তিনি উর্বরতা ও সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তার প্রধান শত্রু হল মৃত্যু। জীবন, বৃদ্ধি ও আয়ুর পরিপোষকরূপে প্রজাপতি ধ্বংসকারী শক্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে নিরত হয়ে সমস্ত জীবজগতের, বিশেষত মানুষের সমর্থক এক মহান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। প্রজাপতির মৃত্যু-বিরোধিতা বিষয়ে বহুপ্রচলিত একটি দেবকাহিনীতে বহু দেবতার অঙ্গহানি বিবৃত হয়েছে। অবেস্তায় সৃজনশীল আহুর মজদা ও ধ্বংসাত্মক অঙ্গ মৈনুযর মধ্যে যে দ্বন্দ্বের বিবরণ রয়েছে, তাই প্রজাপতি ও মৃত্যুর সংগ্রামে প্রতিফলিত; সম্ভবত, একই ভাববস্তু পরবর্তীকালে দেবাসুরের প্রতীকী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল। বহু দেবকাহিনীতে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা প্রতীকী সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল। বহু দেবকাহিনীতে প্রজাপতি বিশ্বস্রষ্টা দেবতাররূপে বর্ণিত হয়েছেন; সকল প্রাণীকেই তিনি পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন। বৈদিক জনসাধারণ কৃষিকার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং জন্মপ্রক্রিয়া, উর্বরতা ও প্রাচুর্যের সঙ্গে আরও স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত একজন দেবতার প্রয়োজন তাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল : ফলে, প্রজাপতি ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এই দেবতাকে প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে; কালক্রমে তিনি যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম্য লাভ করেছেন। তেমনি বেদের সঙ্গেও প্রজাপতির সম্পর্কের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বৈদিক দেবতারা ক্রমশ তিনটি স্পষ্ট ভাগে বিন্যস্ত হয়েছেন : ব্রাহ্মণ যুগের শেষ পর্যায়ে যাস্ক এই শ্রেণীবিন্যাস নিরুক্ত গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন। দ্যুলোকবাসী, অন্তরিক্ষবাসী ও পৃথিবীবাসী (দ্যুস্থান, অন্তরিক্ষস্থান ও ভূস্থান) দেবতা। একটি প্রস্তকথায় পরম দেবতাত্রয়ীর উৎখান যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতেও এই বিভাজন স্পষ্ট। অনুষ্ঠানবিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা যজ্ঞানুষ্ঠানের

যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে নানারকম দেবকাহিনী উদ্ভাবন করেছে; একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থে এগুলি হ'ল প্রাথমিক পর্যায়ের, অর্থাৎ সবচেয়ে মৌলিক ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণের একটি কাহিনী (৩ : ৯ : ৪ : ২) এখানে সোমযাগে সোমসবনকে বৃত্রহত্যার প্রতীকী উপস্থাপনা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ঐ ব্রাহ্মণে এ জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়; তেমনি গোপথ ব্রাহ্মণে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ মধুবিদ্যাবিষয়ক দেবকথাটিকেও এয়। অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায়।

যে প্লাবনে সারা সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়েছিল, শতপথ ব্রাহ্মণের সেই মহাপ্লাবন বিষয়ক বিখ্যাত কাহিনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনু তাঁর রক্ষিত একটি মৎস্যের সাহায্যে সে প্লাবন থেকে রক্ষা পান ও পুনর্বার বিশ্বসৃষ্টি করেন যজ্ঞের সাহায্যে। যজ্ঞের সৃষ্টিকারী ভূমিকা এ কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ ব্রাহ্মণে উর্বশীর বিরহে কাতর পুরূরবার সঙ্গে গন্ধর্বদের কথোপকথনে যজ্ঞের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে; এই প্রত্নকথার উৎস ইন্দো-হিত্তীয় পর্যায়ে–পণ্ডিতরা এমন অনুমান করেছেন। একে আমরা প্রাচীনতম উৎসজাত কথাগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী অভিব্যক্তির অন্যতম বলে গণ্য করতে পারি। সম্ভবত, এই কাহিনীটির সবচেয়ে প্রাচীন এবং সেই সঙ্গে বিপরীতপ্রান্তীয় প্রকাশ রয়েছে, ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য 'এপিক অব গিলগামেশ'-এর অন্তর্গত দেবী নের্‌গাল-এর সঙ্গে মর্ত্য নায়ক গিলগামেশের প্রণয় আখ্যানে। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেবতা ও মানুষকে প্রণয়ীযুগলরূপে উপস্থাপিত করে বহু শিল্পসুষমাময় ও গীতিকবিতার লাবণ্যযুক্ত কাহিনী গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অবশ্য দেবকাহিনীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, উপকরণ ও অর্ঘ্য নিবেদনের পদ্ধতির পবিত্রতায় মণ্ডিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত কিছুর মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্যই সমর্থিত হচ্ছে : দেবতারা মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অনুষ্ঠান সমাধা করেছিলেন, মানুষের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রকৃতপক্ষে সীমিত সময়ের পরিসরে তারই পুনরায়োজন সূচিত হয়। মানবিক জগতে যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খগুলির তাৎপর্য কোনো প্রত্নপৌরাণিক কার্য বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনীয়, যেহেতু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরূপে যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খাসমূহের সুনিয়ন্ত্রিত পরিসর নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সংকটপূর্ণ অবস্থার তাগিদেই বিশেষ বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান বিহিত হ'ত; ঘটনাপ্রবাহ যখন প্রতিকূল, দেবকাহিনী তখন বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাকালের সূচনালগ্নে প্রত্যাবর্তন করে সমাজে নুতনভাবে শুদ্ধতার প্রবর্তন শুরু করে এবং নুতন সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটায়। প্রখ্যাত গবেষক মির্চা এলিয়াদের মতে, প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজজীবনের সংস্কার সম্ভব নয়; উৎসে প্রত্যাবর্তন করেই শুধুমাত্র জীবনকে নুতনভাবে সৃষ্টি করা যায়।

কোনো কোনো দেবকাহিনীতে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন সরল বিবৃতির মাধ্যমে যজ্ঞনির্বাহী পুরোহিতদের দক্ষিণারূপে স্বর্ণদানের গুরুত্বকে শতপথ ও জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট করা হয়েছে। শতপথে প্রাপ্ত বাক ও সোমসংক্রান্ত প্রত্নকথাটিও আকর্ষণীয়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্টতই জাতিভেদ প্রথা সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, কারণ এখানে দেবতাদের মধ্যেও জাতিভেদের প্রতিকল্প সন্ধান আমরা লক্ষ্য করি। জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে বিশ্বেদেবাঞ্চকে বৈশ্য বলা হয়েছে। নিষাদদের পঞ্চম জাতিরূপে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ঐ ব্রাহ্মণেই দেবলোকে তার সমর্থন খোজা হয়েছে। আবার শতপথে সোমকে ক্ষত্র, অন্যান্য ওষধিকে বৈশ্য বা দুগ্ধকে ক্ষত্র ও মদ্যকে বৈশ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তখনকার সমাজে চিকিৎসকদের যে অবজ্ঞা করা হত, তা অশ্বীদের সোমপানে অধিকার নিষেধ

সংক্রান্ত শতপথ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। সোমপানে সব দেবতার অবিসংবাদিত অধিকার, চিকিৎসক বলে অশ্বীদের তার থেকে বঞ্চিত করার কাহিনীতে চিকিৎসকদের সম্বন্ধে সমাজের মনোভাব প্রতিফলিত।

তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান বেশ কয়েকটি কাহিনীতে অভিব্যক্তি। বিশেষত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটিতে (৩ : ২৩) পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার যৌক্তিকতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে নারীর বহুবিবাহ রীতির নিন্দা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা নির্ণয় প্রসঙ্গে গোপথ ব্রাহ্মণের উত্তরভাগে দৃষ্টান্তরূপে বলা হয়েছে যে, দেবতারা একে অপরের বাড়িতে বাস করেন না। সম্ভবত, এতে সমাজের সেই পর্যায় আভাসিত হয়েছে। যখন সংযুক্ত পিতৃতান্ত্রিক 'কুল' বা বৃহৎ পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছিল। ঐ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে বেদাভ্যাসরত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদানের সমর্থনে একটি প্রত্নকথা। কথিত হয়েছে। একই গ্রন্থে নৃত্যগীত থেকে ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত করার ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে সে বিষয়ে সামাজিক রক্ষণশীল মনোভাবকে লক্ষ্য করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে যৌতুক প্রথা প্রতীকীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কিছু কিছু দেবকাহিনীতে বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিবর্তন ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ব্রাহ্মণসাহিত্যে দেবীদের তুলনামূলকভাবে নুতন আবির্ভাব ঘটেছে; তবে, তারা এখনো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্ব অর্জন করেন নি, এখনো শুধুই প্রখ্যাত দেবতাদের স্ত্রী ব'লেই পরিচিত। তাদের অবস্থান মোটামুটিভাবে পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তনযোগ্য, এবং মাতা পৃথিবীর মধ্যে তাঁদের সমন্বয় লাভের প্রবণতা চোখে পড়ে।

এই কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। একই কাহিনীর নানা বিভিন্ন রাপে বিভিন্ন ব্রাহ্মণে, কখনো বা একই ব্রাহ্মণের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যায়। তাই জল অগ্নির মাতা ও অগ্নি তার গর্ভ রূপে কথিত হয়েছেন। বস্তুত দেবকাহিনীগুলির প্রকৃত রূপ অপেক্ষা সেগুলির প্রসঙ্গ ও পশ্চাৎপট। অনেকসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনীই কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে যথাযথ বলে বিবেচিত হয়। তবে যে যুক্তিতে উপযুক্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রত্নকথার সম্পর্ক নিগীত হয়, তাতে আসলে কোনো যুক্তিই নেই। যে জনগোষ্ঠী অল্পকাল পূর্বে কৃষি ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে, তার সর্বাধিক উদ্বেগের কারণ ছিল নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি। বহু কাহিনীর সূচনায় প্রজাপতি খাদ্য অন্বেষণ করছেন, এমন কথা আছে। উদ্বিগ্ন প্রজাপতি শেষপর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানকে ধ্যানের মধ্যে দর্শন করেন ও সেই অনুষ্ঠানের সাহায্যে খাদ্যলাভ করেন। ফলত, এই অনুষ্ঠানই পরবর্তী কালে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতিলাভের জন্যে জনগোষ্ঠীর নিকট একটি নির্দিষ্ট যজ্ঞের প্রতিকল্প হয়ে ওঠে। আমরা যদি তৎকালীন বহুধাবিপন্ন জীবনের নানা আতঙ্ক, আশঙ্কা, নিরাপত্তার অভাববোধের নানাবিধ কারণের কথা বিবেচনা করি, তাহলে তাদের এই নিরন্তর উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত ব'লেই মনে হয়; যেহেতু মৃত্যু মানবজাতির একমাত্র চিরন্তন অপরাজিত শত্রু, তাই এসব কাহিনীর দ্বারা মৃত্যুকে পৌরাণিক কল্পনার স্তরে জয় করে মানুষ নিজের জীবনের আশাকে পুনরুজ্জীবিত করত এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনের ওপর বিশ্বাসকে নুতনভাবে সৃষ্টি করত।

সর্বাধিক প্রচলিত দেবকাহিনী হ'ল দেবাসুর যুদ্ধ; একটি বিশেষ অর্থে তা ব্রাহ্মণসাহিত্যের সব দেবকাহিনীর কেন্দ্রস্থলে থেকে সব মৌলিক প্রকরণকে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেছে। এই প্রকরণে পৃথক সাহিত্যবর্গ রূপে ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট চরিত্রও প্রতিফলিত। প্রাসঙ্গিক অনুপুঙ্খগুলি বাদ দিলে প্রত্নকথার মৌল কাঠামোকে এভাবে বিবৃত করা যায় : (ক) কোনো কিছু

পালিয়ে যায়, হারিয়ে যায়, ভেঙে যায় বা কোনো ব্যক্তি বা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব অনুভূত হয়; (খ) দেবগণ প্রাচীনতর অনুষ্ঠান পালনের চেষ্টা করেন; (গ) সেসব ব্যর্থ হয়; (ঘ) দেবগণ প্রজাপতির নিকট ধাবিত হন; (ঙ) প্রজাপতি একটি নুতন যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান বা তার ক্ষুদ্র কোনো অনুপুঙ্খের নির্দেশ দিয়ে সেটিকে পালন করার জন্যে দেবতাদের আদেশ করেন; (চ) দেবতারা এই নতুন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং (ছ) কাঙ্খিত ফল লাভ করেন। সাধারণত এর দ্বারাই ঘটে দানবশক্তির পরাজয়। এধরনের দেবকাহিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল নুতন কোনো যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের প্রবর্তন, তাই অন্যান্য প্রাচীনতর পদ্ধতির ব্যর্থতার অজুহাত আবিস্কৃত হয়। শেষ পর্যন্ত নুতন কোনো অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যার দ্বারা অতীতে দেবতাদের ইউসিদ্ধি হয়েছিল ব'লেই ভবিষ্যতে যার কার্যকরী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবেস্তায় কল্যাণপ্রসু দেবশক্তিকে 'অসুর' এবং দানবদের 'দএব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দএব ও অসুরদের (আহুর মাজদা স্বয়ং যাদের প্রধান) মধ্যে কঠিন সংগ্রাম হয়েছিল। [যশট ১৪ : ৫৫]। দএবদের কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নেই বলে তারা অসত্য অনুসরণকারীরূপে নিন্দিত। অজ্ঞতাবশত দএবগণ পবিত্র অগ্নিতে ভুল ইন্ধন প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ ভুল ভাবে অনুষ্ঠান সমাধা করত। বৈদিক প্রত্নপুরাণে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অসুরদের প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের প্রত্নকথাগুলির মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধই প্রধান—তবে অবেস্তায় যারা দএব, ব্রাহ্মণে তারাই অসুর বলে পরিগণিত (অর্থাৎ অবেস্তার অসুর বিপবীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় বৈদিক সাহিত্যে দেবতায় পরিণত হয়েছে)। স্পষ্টতই প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ দেবকাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে; কেননা প্রাগার্যদের বংশে ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলিতে জয়লাভ করার কয়েক শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ

সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তখন এই সংগ্রামকে অন্য নৈতিক স্তরে উত্তোরণ করিয়ে ভাল ও মন্দ, সত্য ও অসত্যের সংগ্রামরূপে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল না। জয়ীপক্ষ সর্বদাই কল্যাণের প্রতিভূ এবং পরাজিত পক্ষ অনিবার্যভাবে অমঙ্গলের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত হয়ে থাকে, তাই আর্যরা দেবতায় ও প্রাগার্যরা অসুরে পরিণত হ'ল। আরো কিছুকাল পরে এই সংগ্রামকে যখন নৈতিক তাৎপর্যেমণ্ডিত করা হ'ল, তখন এটা হয়ে উঠল। সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম সুব্যক্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে (৯ : ৫ : ১৩-১৬)।

কখনো কখনো একটি প্রাচীন প্রত্নপৌরাণিক বৈপরীত্যমূলক তুলনা দেখতে পাই আলোকশক্তির প্রতিভূ ও বিজয়ী আর্যদের সুদূর প্রতিকল্প আদিত্যবর্গের দেবগোষ্ঠী এবং প্রাচীন অগ্নি উপাসক পুরোহিত অঙ্গিরাদের মধ্যে। অগ্নির সঙ্গে রাত্রির স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং অঙ্গিরায় সঙ্গে জাদুশক্তির সম্বন্ধ। লঘু ঐতিহ্যের সঙ্গে বৃহৎ ঐতিহ্যের সম্পর্ক যেহেতু প্রতিষ্ঠিত তাই লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগই সম্ভবত ঐ বৈপরীত্যের ভিত্তি রচনা করেছে। দেবতা ও দানবের মতো আদিত্য এবং অঙ্গিরা-উভয়েই প্রজাপতির সন্তান; হয়তো বা সীেরাদেব ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতার দ্বান্দ্বিক অবস্থােনই তাদের বৈপরীত্যের মূলে।

শতপথের একটি প্রত্নকথা অনুযায়ী বাক দানবনিধনের শক্তি অর্জন করে একটি যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ক্রমশ মনুর পত্নীতে ও তারপর যজ্ঞীয় উপকরণগুলিতে বাক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভিন্ন স্তরে বাক যে অমঙ্গলজনকশক্তি ধ্বংস করতে করতে অবশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন তা লক্ষণীয়। বাকের মাধ্যমে শাব্দিক অভিব্যক্তির গৌরবায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের অর্থবোধের জন্যে জ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। বার বার বলা হয়েছে যে,

যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত সুফল সম্পূর্ণত সেই ব্যক্তি লাভ করেন যিনি যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের তাৎপর্য সম্যক অবগত আছেন। বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের প্রশংসা, যজ্ঞীয় গীতির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ত-বর্ধমান আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলির বিশুদ্ধ প্রয়োগ–এই সমস্তকেই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে হবে। স্পষ্টতই এর পশ্চাতে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতি আছে। এই পরিস্থিতি হ'ল নির্ম্মফল যজ্ঞানুষ্ঠানের অতিপ্রয়োগের বিষম প্রতিক্রিয়া, তার সংশোধনের জন্যে অস্থায়ী প্রচেষ্টা এবং যজ্ঞধর্মেরই আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করার শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা আবার ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তিম অংশের চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য। উচ্চারিত শব্দে নতুন গৌরব যুক্ত হওয়ায় বহু প্রত্নকথায় বাকএর প্রধান ভূমিকা স্পষ্ট। তবে সংহিতায় বাক-এর সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব ব্রাহ্মণে বজায় থাকে নি; শতপথের একটি দেবকাহিনীতে বাক ও মনের দ্বন্দ্বে বাক-এর পরাজয় এবং প্রজাপতির প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠাণের গুরুত্ব যেহেতু সর্বাত্মক, যজ্ঞভাবনা ও যজ্ঞকর্মের প্রেরয়িতা মনের নিকট বাক তাই নিস্প্রভ ও কার্যত অধীন হয়ে পড়েছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ থেকে ৫০০ বা ৪০০ পর্যন্ত রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বিস্তার এবং অনুষ্ঠান ও দেবতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে; তবে সৃষ্টিশীল পর্যায়ের শেষদিকে এই সাহিত্যে নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছে দেবকাহিনীগুলি ক্রমে প্রত্নপুরাণে লোকায়ত হয়ে উঠছে এবং ধীরে ধীরে একটি একেশ্বরবাদী প্রবণতাও পরিস্ফুট হচ্ছে। এমনকি অদ্বৈতবাদী ভাবনার সূত্রপাতও তখনই লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু অংশে আমরা স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকারী রূপে ত্রয়ী দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উত্থানের সূচনা লক্ষ্য করি। তারা কিছুকাল পর্যন্ত কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করলেও সকলের ওপরে প্রজাপতি সেই ভাবমূর্তি বিরাজ করেছে যা মূলত ব্রাহ্মণযুগেরই সৃষ্টি।

আমরা আর বৃহস্পতি, ব্রহ্মা, পুরুষ বা ব্রহ্মণস্পতির কথা তত বেশি শুনতে পাই না, যত শুনি প্রজাপতির কথা, কেননা প্রজাপতিই এখন উদীয়মান ও বর্ধমান দেবতা। তিনি স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তাররূপে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেন এবং তার উপাসকদের জন্যে শান্তি, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চিত আশ্বাস দেন। এই সময়েই দেবতাদের সংখ্যা কমানোর জন্যে একটি সচেতন প্রয়াসের সূচনা হয় এবং গণদেবতাগুলির মধ্যে এই সংক্ষেপীকরণের চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। প্রজাপতিই এখন আমাদের সকল মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কেননা এই যুগেই কৃষিকার্য, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিবিধ কারুশিল্পের আবিষ্কার ও বিস্তার ঘটে। সম্ভবত এই সময়েই ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পগুলি সংগঠিত হয়ে সঙ্ঘ নির্মাণ করে, অন্যদিকে আর্যদের রাজ্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করার ফলে পর্বত ও অরণ্যবাসী প্রাগার্য জনগোষ্ঠীগুলি তাদের অধীন হয়। সে সময়ে তাই শস্যভূমিতে, পশুশালায় ও গৃহে প্রাচুর্য, নূতনতর প্রজন্ম ও উর্বরতার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। বর্ধিত উৎপাদন যেহেতু আবশ্যক ছিল, উর্বরতা ও বৃদ্ধির অধিষ্ঠাতারূপে কোনো উপযুক্ত দেবতার সৃষ্টি তাই অনিবার্য হয়ে উঠল; তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মচর্যা অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন ও একাত্ম হয়েই প্রজাপতি দেবকুলে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহন করলেন। বস্তুত, ব্রাহ্মণসাহিত্যে বারবার প্রজাপতি ও বিষ্ণুকে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্মীভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তবে, মহিমান্বিত অবস্থানে উপনীত হতে বিষ্ণুর আরও কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের কয়েকটি দেবকাহিনীতে আভাসিত হয়েছে যে, খাদ্যের ব্যবস্থাপনা করেই প্রজাপতি তার গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পূর্বোক্ত যুগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র এখন নানা কাহিনীতে প্রজাপতির কৃপাপ্রার্থীএই তথ্যটি এযুগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আলোচিত যজ্ঞানুষ্ঠান যেহেতু মূলগতভাবে দেবকাহিনী ও ঐন্দ্রজালিক অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই একমাত্র নির্দিষ্ট প্রসঙ্গেই তার

বিশ্লেষণ সম্ভব; কেননা পৃথক অনুষ্ঠানের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি সতর্কভাবে ব্যাখ্যা করলেই আমরা এই মন্তব্যের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারব।

ইন্দ্রজাল বা জাদু

সারা পৃথিবীর সব প্রাচীন ধর্মেই ইন্দ্রজালের বিপুল ভূমিকা ছিল। ভারতবর্ষেও তাই ছিল। ধর্মচর্যার কোনো অংশকে ইন্দ্রজালরূপে পৃথক করে নেওয়ার প্রবণতা স্পষ্টতই অযৌক্তিক, কেননা দেবকাহিনী ও যজ্ঞানুষ্ঠানের সম্পর্ক নিতান্তই ছদ্ম-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি বিশেষ অর্থে সমস্ত অনুষ্ঠানই মূলত ইন্দ্রজাল-নির্ভর; যজ্ঞে আচরণীয় ক্রিয়াকাণ্ড মূলত ও আদিতে স্বতন্ত্রই ছিল, কেবলমাত্র কোনো ভঙ্গুর ও অর্ধবিস্মৃত যোগসূত্র তাদের দেবকাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কল্যাণপ্রসূ ইন্দ্রজালের সঙ্গে অভিচার বা নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক ইন্দ্রজাল খোলাখুলিভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বহু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার অনুপুঙ্খকে অবচেতনভাবে ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে মণ্ডিত করা হয়েছে। যজ্ঞাগ্নির অন্যতম মৌলিক বৃত্তি হ'ল দানব, ভূতপ্রেত ও পিশাচ জাতীয় অন্ধকারের অপশক্তিগুলির বিতাড়ন। যজ্ঞের কিছু কিছু উপাদানও ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিবেচিত হতে; বিশেষ স্তোত্র অনুষ্ঠানের ব্যবহৃত হত। তবে, কোনো অনুষ্ঠান প্রচলিত যজ্ঞের ক্রমের বিপরীতক্রমে প্রযুক্ত হলে তা শত্রুকে ধবংস করে, এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। সমগ্র জনগোষ্ঠী যেসব ভাবী অমঙ্গল চিহ্ন বা সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল, গূঢ় আনুষ্ঠানিক শক্তিতে অন্বিত হয়ে সেসব ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অঙ্গীভূত; অনুপুঙ্খের ব্যাখ্যায়। এই প্রবণতা স্পষ্ট। ঐতরেয়, শতপথ ও তৈত্তিরীয়ে এর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অক্ষরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে আবিষ্কৃত

সৌত্রিমণী যাগ যেহেতু বহু জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল, তাই তাতে বিচিত্র ধরনের লোকায়ত ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস অভিব্যক্তি হয়েছে, যেমন শতপথে (১৩ : ৯ : ৩) কথিত হয়েছে যে, সৌত্রিমণীতে নেকড়েবাঘ, বাঘ ও সিংহের লোম সুরায় নিক্ষিপ্ত হয় – সেইসঙ্গে মিশ্রিত হয় নেকড়ে বাঘের মূত্র (ওজঃ বা বীরত্বের জন্য), বাঘের অন্ত্র (জুতি বা গতির জন্যে), সিংহের রক্ত (মৃত্যুর জন্যে)। আর্যরা যে অঞ্চলে থেকে এসেছিলেন সেখানে বাঘের বসতি ছিল না; তারা পরিক্রমার পথে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা ভারতবর্ষে উপনীত হয়ে বাঘের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সৌত্রিমণী যাগটি আদিতে অসুরদের কাছে ছিল, পরে তা দেবতাদের কাছে উপস্থিত হয়। বলাই বাহুল্য, প্রাগার্য জাতিদেরই 'অসুর' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

সৌত্রিমণী যাগের দক্ষিণারূপে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি নির্দেশিত হয়েছে : নতুন বস্ত্র, কাজল, পায়ের মলম, পুরাতন যব, পুরাতন আসন ও বালিশ। এখানে স্পষ্টতই আমরা সাধারণ জনতার মধ্যে প্রচলিত–সম্ভবত, অসুর বা প্রাগার্য জাতির ব্যবহার্য বিভিন্ন উপাদানের দেখা পাচ্ছি, কেননা কেবলমাত্র এখানেই পুরাতন দ্রব্য দীর্ঘায়ুকে সুনিশ্চিত করে এমন বিশ্বাসের কথা পাই। অন্যত্র কোথাও যজ্ঞ দক্ষিণারূপে পুরাতন দ্রব্য প্রদত্ত হয়নি। সম্ভবত প্রাগার্য উপাদানই 'পুরাতন' রূপে তখন গণ্য হতে পারত।

মারুতিহাোমের সপ্তম আহুতি, শতরুদ্রীয় হাোম, অগ্ন্যাধান, প্রবর্গ্য যাগ প্রভৃতির বিভিন্ন অনুপুঙ্খে ইন্দ্রজালের বহু বিচিত্র লোকায়ত বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রেত্যাবিষ্ট মানুষই উন্মত্তার শিকার এবং কেবলমাত্র উপযুক্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই এর নিরাময় সম্ভব। শত্রুকে পর্যুদস্ত করার প্রয়োজনে ইন্দ্রজাল বারবার প্রযুক্ত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞাগ্নি সম্পর্কিত বক্তব্যে (১১ : ৫ : ৩, ৮-১২) ভাবী অমঙ্গলের

আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে; এতে বোঝা যাচ্ছে, সমাজ ক্রমশ ভাবী অমঙ্গল গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নির্মাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শেষ পর্যায়ের সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলি বিশেষত ষড়বিংশ ও সামবিধান, গার্হস্থ্য ও গোতীজীবনের যাবতীয় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এ অংশগুলি ভবিষ্যদ্বাণী, ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা ও দুর্ঘটনার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কখনো কখনো কুসংস্কারপূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা দিয়েছে, যেমন শতপথে রয়েছেঃ 'একজন নায়ী, একজন শূদ্র, একটি কুকুর ও একটি কালো পাখি-এ সমস্তই মিথ্যা, এদের দেখা উচিত নয়, যাতে সমৃদ্ধি ও অমঙ্গল, আলো ও অন্ধকার, সত্য ও অসত্য পরস্পর মিশ্রিত হতে না পারে।' (১৪ : ১ : ১ : ৩১)। এই তালিকায় নারী ও শূদ্রের অন্তর্ভুক্তি তাদের সামাজিক অবস্থানের নির্মম সত্যই উদঘাটিত করেছে।

দেবসঙ্ঘ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দেবসংঘ সংহিতা থেকে ভিন্ন। কয়েকজন প্রাচীনতর দেবতা যেমন উবা, ভগ, অর্যামা, মার্তণ্ড, দক্ষ, দৌঃ, পর্জন্য, বায়ুবাতাঃ এখানে সম্পূর্ণই অদৃশ্য হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা, মরুতঃ, রুদ্রাসঃ– ইত্যাদির মতো কয়েকজন প্রধান প্রাচীনতর দেবতার মহিমা খর্ব হয়ে গেছে। তৃতীয়ত, রুদ্র, বিষ্ণু, বৃহস্পতি ও ঋভুদের মতো প্রাচীনতর গৌণ দেবতারা ক্রমশ মহিমা ও তাৎপর্যের দিক দিকে উন্নততর অবস্থানে পৌঁছেছেন। চতুর্থত, কয়েকজন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে যাদের মধ্যে প্রজাপতি প্রধান; এছাড়া রয়েছেন 'মীঢুষী' ও 'জয়ন্তে'র মতো অর্বাচীন দেবতা এবং কয়েকজন গৌণ অর্ধদেবতা।

দর্শপুর্ণমাস যজ্ঞের অন্তর্গত মিত্রবিন্দেষ্টিতে কয়োজন দেবতার জন্যে কিছু কিছু হব্য নির্দিষ্ট হয়েছে, যেমন–অগ্নিকে অন্ন, সোমকে রাজ্য ও বরুণকে সাম্রাজ্য, মিত্রকে যোদ্ধার বীরত্ব, ইন্দ্রকে ওজস্বিতা, বৃহস্পতিকে ব্রাহ্মণ্য গৌরব, সবিতাকে রাষ্ট্র বা প্রশাসন, পূষাকে ভাগ্য, সরস্বতীকে পুষ্টি এবং তুষ্টাকে রূপ ও আকৃতি। ব্রাহ্মণসাহিত্যের সর্বত্র এসব শব্দই আলোচ্য দেবতাদের নির্দিষ্ট বিশেষণে পরিণত হয়েছে; ব্রাহ্মণসাহিত্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করার পূর্বে এগুলি সম্ভবত সামূহিক অবচেতনে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মাণ্য প্রত্নপুরাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, আদর্শ চরিত্ররূপে দেবতাদের চিত্রিত করার কোনো প্রয়াসই এখানে দেখা যায় না। বহু রচনা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রের পাপের তালিকা প্রণয়ন করেছে, যেমন তাণ্ড্য মহা ব্রাহ্মণে (১৩ : ৬ : ৯) রয়েছে, 'দীর্ঘজিহ্বী' নামে দানবীকে শক্তিদ্বারা পরাভূত করতে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্র কুৎস সুমিত্রের সাহায্যে দানবীকে তাঁর প্রতি কামনাসক্ত করে তুললেন; তারপর দু'জনে মিলে কুৎস সুমিত্রকে বধ করলেন। এছাড়া শালবৃকদের কাছে যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত 'যতি'দের সমর্পণ বিষয়ে যে প্রাচীন প্রত্নকথাটি ইন্দ্র সম্পর্কে প্রচলিত ছিল, তা' আবার এখানে নতুনভাবে বিবৃত হয়েছে। অবশ্য ইন্দ্র এখানে 'যতি'দের প্রতি বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করলেন। 'বৈখানস' নামে প্রাগার্য সম্প্রদায়টি ইন্দ্রের প্রতিভাজন ছিল। সম্ভবত আক্রমণকারী আর্যদের প্রতি 'যতি'র বিরাপ মনোভাব প্রকাশ করতেন, আর বৈখানসদের মনোভাব ছিল তাদের প্রতি অনুকুল; সেইসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা ধরনের মধ্যেও হয়তো বা ভিন্নতা ছিল।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ইন্দ্রের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। এখানে তাঁর সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস প্রজাপতি। তবে পূর্বতন পর্যায়ের বীরত্বজনিত গৌরব যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নি, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্র তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তপস্যায় নিরত হয়েছেন। ব্রাহ্মণে এরূপ প্রচুর উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় যে, এতে প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী আর্যদের

অপরাধীসুলভ মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে, যেহেতু প্রাগার্যদের সঙ্গে বহু যুদ্ধে তারা অন্যায় ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছিল।

সমাজ (ব্রাহ্মণ)

পৃথক বর্ণরূপে ব্রাহ্মণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এবং তখনই ব্রাহ্মণ রচনার প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মাত্র ঋকে অন্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছিল; জাতিভেদপ্রথা, অন্তত প্রাথমিকভাবে, সমাজের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই শুধু ঐ মন্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সর্বত্র ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে অবিসংবাদী সামাজিক সত্যরূপে ইঙ্গিতে ধ'রে নেওয়া হয়েছে; অবশ্য জনসাধারণের প্রতি তাদের দায়িত্বের আভাসও পরিস্ফুট। ব্রাহ্মণ জনসাধারণকে শিক্ষাদান করে তার সামাজিক ঋণ পরিশোধ করে। গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগ (২ : ২) বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণের সাতটি অতিরিক্ত গুণ রয়েছে : ব্রাহ্মাণ্য মহিমা, খ্যাতি, নিন্দা, ক্রোধ, অহংকাব, সৌন্দর্য ও সুঘ্রাণ। অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে যে কায়িক শ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তার পরিবর্তে কিছু কিছু বাধ্যবাধকতাও তাকে মেনে নিতে হয়। যেমন : অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিক শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়। তবে, স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সব ব্রাহ্মণই পুরোহিত ছিলেন না; বর্ণগত বৃত্তিভেদও কিছু শিথিল, এমন কি কতকটা পরিবর্তনসহ ও সঞ্চরণশীল ছিল। কিন্তু, সাধারণভাবে ব্রাহ্মণেরা ছিল অবকাশভোগী শ্রেণী, সমাজে তাদের অবস্থান অপর্যাপ্ত সুবিধাভোগী রূপেই স্বীকৃত ছিল। অবশ্য তখনো পর্যন্ত, অন্তত্পক্ষে এ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে, তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতপূর্ণ বলা যায় না। লোহার লাঙলের ফলা, মুদ্রা, বহির্বাণিজ্য যখন প্রবর্তিত হ'ল এবং সেই

সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল—ঐসব রাজা ব্যয়সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেন। এমন যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি রাজন্য শ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক হয়ে উঠল; স্বাভাবিকভাবেই অন্যদিকে পুরোহিত শ্রেণী সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রচুর অর্থ ও সমৃদ্ধি তাদের করায়ত্ত হ'ল।

ব্রাহ্মণরা যদিও প্রাথমিকভাবে যজ্ঞের প্রয়োজনেই বর্ষপঞ্জী আবিষ্কার করেছিলেন, তবু একই সঙ্গে তা সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এই বর্ষপঞ্জী আবিষ্কার করে এবং ইন্দ্রজাল ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রতীকায়ণ সম্পর্কে উন্নততর জ্ঞানের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা ক্রমশ অধ্যাত্মবিদ্যার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন; তারা বর্ণগতভাবে ক্রমশ অধিকতর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে জনসাধারণের সম্ভ্রমভাজন হয়ে উঠলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীনতর জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রতিতুলনীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন কেলটিক ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের 'মায়া' সভ্যতা এবং ইহুদী, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পুরোহিতবর্গ। প্রাচীন ভারতীয় যাজকতন্ত্রের সঙ্গে ব্যাবিলনীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের সম্ভবত অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 'ভূদেব'-রূপে অভিহিত ব্রাহ্মণদের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল, তা ধীরে ধীরে সুস্থিতিযুক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের পুরোহিতরা আত্মস্থ করে নিলেন। এই পুরোহিতরা যেহেতু মূলত দেবতাদের এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাই ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক পুরোহিতরা ধর্মীয় রাজাদের সম্ভ্রমের আসনটি থেকে অধিকারচ্যুত করে সেই আসনে নিজেরা সমারূঢ় হলেন। পরবর্তী যুগে এই পুরোহিত সম্প্রদায় ক্রমে অলক্ষিতভাবে পুরাতন বৈশিষ্ট্যগুলি হারিয়ে ফেলে নূতনতর বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হলেন।

তাদের সমৃদ্ধি, বিলাসিতার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। এই ঘটনা ঘটার পূর্বে পুরোহিতদের কার্য-পদ্ধতিকে যেভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছিল, তার বাস্তব ভিত্তি বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল। যজ্ঞের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত, জটিলতর, বহুগুণ বর্ধিত ও দীর্ঘায়িত করেই তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। আবার এই সমগ্র প্রক্রিয়াই সম্ভব হয়েছিল ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত শস্য উৎপাদনের ফলে, কেননা একমাত্র এধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতেই জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশকে উৎপাদনের শ্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব। বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশ্বাসে ইন্ধন যোগানো হ'ত যে, সৃষ্টির সূচনায় দেবতারা উর্বরতা, শস্য ও প্রাচুর্যকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনে যা করেছিলেন, পুরোহিতরা আনুষ্ঠানিকভাবে যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে তারই পুনরুষ্ঠান করছেন। এইভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পুরোহিতদের কাল্পনিকভাবে এক তুরীয় আধ্যাত্মিক ভূমিকায় উন্নীত করা হত। দীক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমরা এর স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি।

নির্দিষ্ট পুরোহিতদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবিধ সামাজিক রীতি দেবকাহিনীর মাধ্যমের উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন-অশ্বমেধ যজ্ঞে পুরোহিতরা হস্তী বা অশ্বে আরোহন করে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩ : ৮ : ১ : ২) বলা হয়েছে যে, তারা মোট চারটি ভাগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রবেশ করতেন। যেমন : (১) অধিবর্ষ, ব্রহ্মা, হাোতা ও অগ্রীধ্র; (২) মৈত্রাবারুণ ও প্রতিপ্রস্থতা; (৩) প্রস্তোতা (তারপরই শুরু হত দীক্ষানুষ্ঠান) এবং (৪) ব্রাহ্মাণাস্থংসী, আচ্ছাবাক, নেষ্টা, প্রতিহর্তা, গ্রাোবষ্টুৎ, পোতা, উন্নেতা ও সুব্রহ্মণ্য।

অবেস্তায় যজ্ঞের প্রাচীনতম ইন্দো-ইরাণীয় রূপের অভিব্যক্তিকে মনে রেখে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রতিফলিত পুরোহিতদের কার্যাবলীর দ্রুত বৃদ্ধি বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঘটনা।

‘মহাব্রত’ যজ্ঞে উদগাতা নামক সমাবেদীয় পুরোহিতটি গান করতেন। ঋগ্বেদীয় হাোতা একটি দোলনায় উঠে সেখান থেকেই ঋতুমন্ত্র আবৃত্তি করতেন। যজুর্বেদীয় অধ্বর্যু একটি শিলাখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয়ে শপথ গ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য পুরোহিতরা বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট থাকতেন। এভাবে পুরোহিতদের বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের কার্যাবলীকে পৃথক রাখা হয়। আদিম জাদুচিকিৎসকদের স্তরের বহু অবশেষ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় : ইন্দ্রকে যজ্ঞের আহ্বান করার জন্য মধুর ও উচ্চস্বরে আহ্বানের নির্দেশ, মন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যাধি-অধিষ্ঠাতা প্রেতদের বিতাড়নের জন্য চীৎকার ইত্যাদির মধ্যে আদিম ধর্মস্তবটি রয়ে গেছে।

বিভিন্ন পুরোহিতদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্নপৌরাণিক ব্যাখ্যা কয়েকটি বিশেষ যজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পুরোহিতের কার্যপদ্ধতি বা অবস্থানের যৌক্তিকতা একটি দেবকাহিনীর মাধ্যমে এমনভাবে ‘প্রমাণ’ করা হয়েছ যাতে তাকে অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য বলেই মনে হয়। আবার, এধরনের প্রত্নকথায় প্রযুক্ত আপাত-যুক্তির মৌল বৈশিষ্ট্য থেকে এই সত্য আভাসিত হয়, যে যৌক্তিকতা প্রমাণের ঐ চেষ্টা সমাজের বিলম্বিত যুক্তি অন্বেষণেরই ফল। প্রয়োগ ও প্রদর্শিত কারণের মধ্যবর্তী অন্তর্লীন একটি অসামঞ্জস্য যেহেতু যুক্তির কাঠামোকে দুর্বল করে, তাই যুক্তির অভাব গোপন করার প্রয়োজনে প্রায়ই নিম্নোক্ত ধরনের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে : ‘দেবতারা রহস্যময় উক্তি ভালবাসেন’ ! যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি দীর্ঘায়িত দেবকাহিনীতে (২ : ১ : ২ : ৮) যজ্ঞে প্রদত্ত পশুবলির যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

বহুবার। কথিত হয়েছে যে, বিশেষ কোনো একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দেবতারা স্বর্গে যেতে পেরেছিলেন। এটা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই পর্যায়ে পার্থিব সুখী জীবনকে মৃত্যুর পরে স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত

করার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এখানে এই তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে দেবতারা পৃথিবীতে বাস করতেন এবং তৃতীয়ত, কোন মানুষকে স্বর্গে পাঠানোও কোনো কোনো যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব, লক্ষণীয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ : ৬ : ৫ : ২৭) কথিত হয়েছে যে, বাজপেয় যাগে যজমান ও তার পত্নী একটি মইয়ে ওঠেন–যার দ্বারা তাঁরা প্রতীকীভাবে স্বর্গে যান। শামান বা জাদুপুরোহিত যে অনুষ্ঠানে 'ভর'-এর মধ্যে স্বর্গে আরোহন করতেন, তার সঙ্গে সমগ্র বাজপেয় যাগটির একটি নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। আবার একই সঙ্গে আমরা অনুষ্ঠানের সচেতন অধ্যায়ীকরণও লক্ষ করি। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ক বিধি নিমেষের অর্থে 'ব্রত' ব্যাপারটি অগ্নিচয়ন সম্পর্কিত একটি আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে যে আত্মনিগ্রহের ধারণা রয়েছে, তার মধ্যে আমরা তৎকালীন 'যোগী' সম্প্রদায়ের প্রভাবের নিদর্শন লক্ষ করি। সম্ভবত, এই সম্প্রদায়টি প্রাগার্য বা অবৈদিক আর্য জনগোষ্ঠীগুলির।

দক্ষিণাকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারে বারে নানাভাবে মহিমান্বিত করা হয়েছে, যাতে যজমানের পক্ষে দক্ষিণা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ যজমানের অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন পাপকে বিনষ্ট করে (৩ : ৮ : ৪ : ১৫)। পুরোহিতরা তাদের সমস্ত সময় যজ্ঞবিদ্যাশিক্ষা ও যজ্ঞসাহিত্যে প্রকাশিত তত্ত্ব ও ব্যবহার-বিধি প্রয়োগের জন্যই ব্যয় করতেন; তাই দক্ষিণই ছিল জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ছিল যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই তারা প্রাচুর্যও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী লাভ করতে পারে। পুরোহিতদের কার্যবলীর জন্য তারা সানন্দেই দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু অপর্যাপ্ত দানের অনুজ্ঞা যেহেতু তখনই শাস্ত্রে দেখা দিয়েছিল, তাই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সর্বত্রই

দক্ষিণা সম্বন্ধে ঐ জাতীয় নির্দেশ অভিব্যক্ত হ'ল। বিশেষত, অশ্বমেধ যজ্ঞে দক্ষিণার বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্য এক অকল্পনীয় স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তা কঠোপণিষদের নচিকেতা উপাখ্যানে প্রবলতর অভিব্যক্তি লাভ করে। 'নচিকেতা অগ্নি'। অতীন্দ্রিয় মহিমার সঙ্গে সম্পর্কিত; এই অগ্নি প্রজজুলনকারীর জন্য ইহলোক ও পরলোকে সমৃদ্ধি-প্রতিশ্রুতি। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে যজ্ঞ-বেদীকে দেবতাদের মিলনভূমিরূপে প্রশংসা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠানের ছোট ছোট অংশ ও অনুপুঙ্খ উপকরণ, কার্য, পুরোহিত, মন্ত্র বা অন্যান্য উপাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ যতই প্রতীকায়িত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্জন করতে লাগল, ততই বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে বিতর্ক ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। তৎকালীন মানসিকতায় দেবকথা ও যজ্ঞানুষ্ঠান মিলে একত্রে যে যৌগিক সামগ্রিকতাকে পুষ্ট করেছে, তাতে প্রতি অনুপুঙ্খই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য। দেবতাদের কাছ থেকে যজ্ঞের পলায়ন ও নূতন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানের দ্বারা পুনরুদ্ধার বিষয়ে বহু দেবকাহিনী বিভিন্ন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এ ধরনের কাহিনীতে যজ্ঞ যে বিরল সম্পদরূপে যত্ন, শ্রদ্ধা ও সতর্কতার দ্বারা অনুষ্ঠেয়— এই ভাবনাই স্পষ্ট। বৈদিক সমাজের ধর্মীয় চেতনা অনুযায়ী যজ্ঞ ছিল সৃজনধর্মী, নূতন প্রজন্মের জন্মদাতা, সৃষ্টিরক্ষাকারী এবং বিশ্বজগতের মধ্যে সাম্য স্থাপনের একমাত্র উপাদান। খাদ্য, গো-সম্পদ, বিজয়, স্বাস্থ্য, আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, সন্তান ও স্বর্গলাভ নিশ্চিত করে যজ্ঞই মানুষের সঙ্গে জড়প্রকৃতি, অন্যান্য প্রাণী, মানুষ, দেবতা- এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও সীেষাম্যযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে বিশ্বজগতের সর্বোত্তম সৃষ্টিশীল ও সংযোগপ্রবণ তত্ত্বরূপে যজ্ঞ মহিমান্বিত হয়েছে। অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরাও গৌরবমণ্ডিত হলেন এবং যজ্ঞের নৈতিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অসামান্য তাৎপর্যযুক্ত হয়ে উঠলো।

প্রখ্যাত গবেষক ই. ও. জেমস বলেছেন যে, যজ্ঞের লক্ষ্য চতুর্বির্ধ : উৎসব, শাস্তিস্থাপন, সম্মানসূচক অর্ঘ্য নিবেদন ও আত্মদান। তঁর মতে এসব কটি লক্ষ্যই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তবে, চতুর্বিাধ লক্ষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণে শাস্তিস্থাপন ও সম্মানসূচক অর্ঘ্যনিবেদনের দৃষ্টান্ত সর্বাধিক পাওয়া যায়; উৎসবের বৈশিষ্ট্য নিতান্ত গৌণ ও অস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। শুধুমাত্র আবণ্যক অংশযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুনর্বিশ্লেষণে আমরা বাস্তবনিষ্ঠ যজ্ঞের পশ্চাদবর্তী আধ্যাত্মিক প্রেরণা রূপে আত্মদানের স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত হতে দেখি।

জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনে এই সময় নুতন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। উপবাস যে ধর্মীয় তাৎপর্য অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছে আত্ব" গ্রহকেন্দ্রিক যোগিসুলভ মূল্যবোধ। সম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান বিপুলভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে; আপাতদৃষ্টিতে যা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত বিবৃতি—তাতে এই মানসিকতা আভাসিত যে, আপাত-অর্থহীন যজ্ঞের দৃশ্যমান অংশের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে গভীরতর কোনো সত্য।

ব্রাহ্মণ যুগে উত্তর ভারতের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্ব শাসক ও রাজসভা ছিল। এদের অধিকাংশই আবার রাজ্যবৃদ্ধি বা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। অতএব, রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং রাজকোষগুলি পূর্ণ করার জন্য ও পৃষ্ঠপোষক রাজাদের সাধারণ সমৃদ্ধি কামনায় রাজপুরোহিতরা নূতন নূতন যজ্ঞ আবিষ্কার করতেন। অর্বাচীন অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম 'বসোর্ধারা' হাোমকে রাজন্যশ্রেণীর বিশেষ যজ্ঞ রাজসূয় ও রাজপেয়-এর তুলনায় অধিকতর অন্তর্গঢ় শক্তিসম্পন্ন বলে মনে করা হত।

যজ্ঞানুষ্ঠানের দুটি মৌলিক ও প্রধান উপাদান অর্থাৎ দেবকাহিনী (ওম্ শ্রাবয় ও শ্রৌষট্) ও অনুষ্ঠান (যজ, যজামহে) আমরা ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত ও অভিব্যক্ত হতে দেখি। প্রথমোক্ত উপাদানে রয়েছে আবৃত্তি ও গান এবং শেষোক্ত উপাদানে আনুষ্ঠানিক কর্ম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই দুটোই আর্যদের যজ্ঞভাবনার স্নায়ুকেন্দ্র গঠন করেছে। অসংখ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতীকীভাবে মানুষের জন্মপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর উপস্থাপিত হয়েছে (তুলনীয় শতপথ ব্রাহ্মণ : ১০ : ১ : ১ : ৮)। এমন কি, যজ্ঞীয় উপকরণগুলিও জন্মপ্রক্রিয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিতসহ জোড়ায়-জোড়ায় উল্লিখিত। বস্তুত, বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়ার সার্বিক প্রতীকী তাৎপর্য কৃষিজীবী ও পশুপালক জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এ-ধরনের সমাজে উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য জনশক্তির প্রয়োজন খুব বেশি। সুস্পষ্ট বাস্তব প্রয়োজন দ্বারাই মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়, আর এই মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রস্নকথা ও আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বেদীর নানাবিধ আকৃতি বিভিন্ন বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে, কিংবা প্রতীকী উপস্থাপনা ঘটায়। প্রধান যজ্ঞগুলিতে প্রতীকী আকৃতি, সংখ্যা ইত্যাদি এমনভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে তাদের মধ্যে অতিজাগতিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছন্দগুলির সঙ্গেও বিশেষ তাৎপর্য যুক্ত করা হয়েছে; বিশেষভাবে সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে বহু ছন্দের নিজস্ব নাম আছে। সুর বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে এই সামমন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুমান করা সম্ভব নয়। এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত রহস্যের একটি বৃহৎ অংশই আমরা বিভিন্ন দেবকাহিনী থেকে অনুমান করতে পারি; এইসব দেবকাহিনীতে এগুলির অতিপ্রাকৃত বা পার্থিব গূঢ় শক্তির কথা বিবৃত হয়েছে। ইষ্টকের সংখ্যা, উপাদান ও নির্মাণপদ্ধতির বহু প্রতীকী তাৎপর্য এখানে বিবৃত হয়েছে। যখন একথা স্মরণ করি যে, আর্যগণ প্রাথমিক স্তরে মৃৎকুটীর-নিবাসী এবং পরবর্তীকালে তারা সিন্ধু

উপত্যকার অধিবাসীদের কাছ থেকে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টক তৈরির কৌশল শিখে নিয়েছিলেন,-কেবলমাত্র তখনই দৃঢ়তা, শক্তি ও স্থায়িত্বের প্রতীকরূপে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইষ্টকের নির্দিষ্ট কিছু স্তরের মাঝখানে যজ্ঞ, জীবন ও সূর্যের প্রতীক রূপে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণনির্মিত মনুষ্য স্থাপন করা হত, যাতে নিরাপত্তা ও প্রকৃত স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বর্ধিত হতে পারে।

অনুষ্ঠানসংক্রান্ত কিছু কিছু নির্দেশ তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে কৌতুহলোদীপক কিছু তথ্য প্রতিফলিত হয়েছে : অগ্নিহোত্র হ'ল গার্হপত্য অগ্নিতে প্রতিদিনের অবশ্য করণীয় একটি অনুষ্ঠান। গৃহস্থ যখন বিদেশে যেতেন, মনে মনে তিনি তার গৃহ থেকে দূরবর্তী হতেন না বলে মনে মনেই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানটি করতেন শতপথ [১১ : ৩ : ১]। যেহেতু এই যুগটি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের যুগ, তাই গৃহস্থকে হয়তো মাঝে মাঝে বৃত্তিগত প্রয়োজনেই গৃহের বাইরে থাকতে হাত; ফলে অবশ্যপালনীয় প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানকে তখন বাধ্য হয়েই অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় পরিণত করা হল, যাতে আচার-পালনে কোনো ছেদ বা ত্রুটি দেখা না দেয়। এই অভ্যন্তরীকরণ

প্রক্রিয়ার মধ্যেই আরণ্যক ও উপনিষদে অভিব্যক্ত পরবর্তী সাংস্কৃতিক পর্যায়ে অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সার্বিক অবমূল্যায়নের স্তরে উপনীত হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সুচিত হ'ল। যজ্ঞ যখন বাস্তব অনুষ্ঠান ছাড়া মানসিক ক্রিয়াতে বিকল্প লাভ করল, তখন বাস্তব অনুষ্ঠানের অপরিণামিতা স্বভাবতই আর তত দৃঢ় রইল না।

যদিও ব্রাহ্মণসাহিত্য মূলত যজ্ঞনির্ভর, তবু একই সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কেও আমরা এর থেকে কিছু কিছু ধারণা গড়ে নিতে পারি। যজ্ঞে খাদ্য ও পানীয়ের কিছু ভূমিকা রয়েছে; আবার, অর্থবাদ অংশে ধর্মীয় ভাষ্যমূলক ও প্রতিবাদাত্মক রচনা রয়েছে বলে জীবনযাত্রা, খাদ্য,

পানীয়, বিনোদন, ব্যাধি, পরিবার, নারীর অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কেও অনেক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। মদ্যপান কিংবা গোমাংস ভক্ষণ যে সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না, তার প্রমাণ রয়েছে প্রাচীনতর। ব্রাহ্মণগুলিতে। অবশ্য, পরবর্তী ব্রাহ্মণগুলিতে দেখা যায় গোমাংস ভক্ষণ সামাজিক অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছে। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য মদ্যপান তখন নিষিদ্ধ হতে শুরু করেছে। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি সহজ দেবকাহিনীতে (শতপথ ৭ : ৫ : ২ : ২) তৎকালীন খাদ্যপরিস্থিতি প্রতিফলিত; সম্ভবত, যজ্ঞে অসংখ্য গোহিত্যার ফলে গোসম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় সমাজে একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছিল। এই অপচয় পূরণ করার উদ্দেশ্যে নূতন ধরনের কিছু অনুষ্ঠানও পরিকল্পিত হ'ল।

কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে নির্দিষ্ট খাদ্য জোগান সম্পর্কে কতকটা নিশ্চয়তা ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় অনিশ্চিত প্রাকৃতিক পরিস্থিতির ফলে ফসল কখনো কখনো অনিশ্চিত হয়ে উঠত। প্রায়ই খাদ্যের জন্য প্রার্থনা , যুক্ত হয়েছে; যজ্ঞে অর্জিত সুফলগুলির মধ্যে যজমানের সর্বাধিক অভীষ্ট এই যে, তিনি খাদ্যের ভোক্তা হতে পারেন এবং ক্ষুধায় যেন কখনো তার মৃত্যু না হয়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য চেষ্টার শেষ নেই, কেননা ক্ষুধাই মৃত্যু। এই যুগে ক্ষুধা প্রকৃত শত্রুরূপে গণ্য হয়েছে–যেহেতু জনসাধারণ ক্ষুৎপীড়িত হয়েই পরাজয় বরণ করে। খাদ্যে বিষপ্রয়োগের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রার্থনাও আমরা লক্ষ্য করি। কখনো কখনো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিংবা পরজন্মে পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রতিশ্রুতি সুনিশ্চিত করার জন্যও প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যুরূপী ক্ষুধার নিবারণ। এ-ধরনের প্রার্থনার আত্যন্তিক গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদি আমরা যাযাবর পশুপালকদের খাদ্যের জন্য তীব্র ও স্থায়ী উৎকণ্ঠার কথা স্মরণ করি; কৃষিকার্য শিক্ষা করে খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে তাদের যৌথ অবচেতনে এই উদ্বেগ নিহিত ছিল।

সঙ্গীত ও নৃত্য ছিল ব্রাহ্মণ যুগের প্রধান বিনোদন। বহুবিধ সাঙ্গীতিক উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় : বাঁশী, বীণা, ঢোল ও দুন্দুভি। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের একটি অংশে (৩৯ : ৫) রয়েছে : 'শিল্প তিন ধরনের–নৃত্য, বাদ্য ও গান'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, দুজন ব্রাহ্মণ অশ্বমেধ যজ্ঞে বীণাবাদন করতেন ও গান গাইতেন। অন্যত্র রয়েছে, ব্রাহ্মণ দিনে এবং ক্ষত্রিয় রাত্রিতে গান করেন; এভাবেই তারা একত্রে রাজ্য রক্ষা করেন। অথচ, তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণসাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই সঙ্গীতের সম্বন্ধে এক দ্বিধান্বিত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়; সমাজে সংগীতজ্ঞদের অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখা হত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি দেবকাহিনী অনুযায়ী (১ : ৩ : ২ : ১৩) 'দেবতারা ব্রহ্মা ও খাদ্য থেকে বর্জনীয় অংশকে পৃথক করেছিলেন, তা-ই যথাক্রমে গাথা নারাশংসী ও সুরায় পরিণত হ'ল। তাই কোনো গায়ক বা মত্ত ব্যক্তির নিকট থেকে জনসাধারণের দান গ্রহণ করা উচিত নয়; যদি কেউ গ্রহণ করে, সে শুধু বর্জিত অংশই পায়।' গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে (২ : ২১) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের পক্ষে গান বা নাচে অংশগ্রহণ অনুচিত।

ইতিহাস (ব্রাহ্মণ)

ব্রাহ্মণ সাহিত্যই আমাদের নিকট ইতিহাস ও ভূগোলের প্রথম দ্ব্যর্থবিহীন উৎসরূপে পরিগণিত, কেননা সংহিতা খুব কম ক্ষেত্রেই নিঃসংশয় তথ্যের জোগান দিতে পেরেছে। ব্রাহ্মণে আমরা লক্ষ্য করি যে, আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে (১ : ৪ : ১ : ১০-১৪) কথিত হয়েছে, 'রাজা বিদেঘ মাধব তার পুরোহিত গৌতম

রহুগণকে বৈশ্বানর অগ্নি-সহ অগ্রসর হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারা সরস্বতী নদীর পূর্বতীর থেকে ক্রমাগত ভ্রমণ করে। সদানীরা নদীর উত্তর তীরে উপনীত হয়ে থেমে গিয়েছিলেন । প্রাচীনতর পুরোহিতেরা যেহেতু বৈশ্বােনর অগ্নি-সহ সদানীরা নদী অতিক্রম করেন নি, তারাও সে-চেষ্টা করলেন না।' এই আখ্যানে প্রকৃতপক্ষে আর্যদের দক্ষিণপূর্ব দিকে বসতি বিস্তারের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে; ঐ সময় তারা কর্ষণযোগ্য জমির প্রয়োজনে জলাভূমি ও পতিত অঞ্চল এবং অরণ্যভূমিকে অগ্নিসাৎ করছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি একটি যথার্থ প্রতীক; কৃষিকার্য ও যজ্ঞের প্রয়োজনে বিপুল অঞ্চলকে অগ্নিদগ্ধ করার নিদর্শন। এখানে রয়েছে। প্রাগুক্ত আখ্যানে পুরোহিত রাজাদের নিবাসের জন্য কোশল ও বিদেহের পূর্ব সীমান্তকে নির্দেশ করেছিলেন। এই দুটি স্থাননামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুধাবনযোগ্য; কোশল মানে হ'ল যে স্থানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়, অর্থাৎ চমৎকার গোচারণভূমি, যেখানে গোসম্পদের জন্য বিপুল খাদ্যের নিশ্চিত জোগান রয়েছে। আবার, বিদেহ মানে হ'ল পাহাড়ের আড়াল নেই এমন সমভূমি, অর্থাৎ বিহার ও বাংলার গঙ্গাবিধৌত উপত্যকা। শতপথের অন্যত্রও কথিত হয়েছে, দিনানুদিনের ক্রমাগত চেষ্টায় অগ্নিকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রাগার্যদের উপর আর্যদের চূড়ান্ত জয়লাভ থেকে বৌদ্ধধর্মের উত্থান পর্যন্ত ব্যাপ্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিবৃত্ত ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রতিফলিত। এই চার বা পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে আর্যরা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-বঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়াটি ছিল শ্রমসাধ্য, দীর্ঘায়িত ও নানাবিধ বিপদে আকীর্ণ; আর্যদের দুঃসাহসী মানসতার প্রকৃত প্রমাণ এতে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নবীনতম গ্রন্থগুলির অন্যতম শতপথ ব্রাহ্মণ সেই সময়ে রচিত হয়েছিল, যখন লোহার লাঙলের প্রবর্তন ও অন্যান্য কিছু উপাদানের অস্তিত্বের ফলে নানাদিকে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। অগ্নি প্রজ্বলন করে নিবিড় অরণ্য ধ্বংস করাকে সংক্ষিপ্ত চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই কৃষিপদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্ষিপ্ততার হওয়াই ছিল কাম্য, কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত লাঙল, হলবাহী পশু ও বহুব্যাপ্ত কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজন অনিবার্য।

ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রাপ্ত নামগুলি আলোচনা করে এবং ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে প্রতিফলিত ভাষাগত বিবর্তন বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি, কৃষিব্যবস্থা পরিণত পর্যায়ে পৌছানোর প্রক্রিয়া কতটা দীর্ঘায়িত হয়েছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে আর্যরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। পুরাতত্ত্ববিদদের খননকার্যের ফলে যে সমস্ত নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিন্ধু উপত্যকার সৎ গা বিকশিত হয়েছিল আধুনিক সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কিছু কিছু অঞ্চলে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের অনেকাংশেই প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুসভ্যতার বলয়বহির্ভুত ছিল। আর্যরা পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সোজাসুজি যাত্রা করেছিলেন; তাদের এই যাত্রার নিদর্শন রয়েছে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে উল্লিখিত স্থাননামগুলিতে। আমরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (কাশ্মীর, কফিরিস্তান, কান্দাহার) গান্ধার, কাম্বোজ, উশীনার ও মদ্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে কুরু, পাঞ্চাল, চেন্দি, কাশী, বংস (বা বৎস), কোশল, বিদেহ ও বিদর্ভ; গুজরাটে শূরসেন, রাজস্থানে সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, শম্ব, বৈরাট এবং বিহার-বঙ্গে অঙ্গ ও মগধের উল্লেখ পাচ্ছি। প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রের মতো প্রাথমিক বৈদিক যুগের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি–আধুনিক জেলার ভৌগোলিক পরিধির চেয়ে তা ব্যাপকতর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ছিল কৌম উৎসজাত ।

সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতেও বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীর বসতিতে তাদের নিজস্ব ধরনের প্রশাসন ছিল; সেখানেই আর্যদের অভিযান হাোক না কেন, এই জনগোষ্ঠীগুলি নিশ্চয়ই প্রতিরোধ তৈরি করেছিল এবং আদিম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আর্যদের প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। বিন্ধ্য পর্বতমালার সংলগ্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ জনবসতিশূন্য বা অতিসামান্য বসতিযুক্ত যে বিপুল অরণ্যভূমি ছিল, আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (সংহিতা সাহিত্যে যার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়) কিংবা যুদ্ধের সময়ে আদিম জনগোষ্ঠীগুলি সেখানে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে গিয়েছিল। এদের অনেকেই পরাজয়ের ফলে আর্যদের দাসে (বা 'দস্যু'তে) পরিণত হ'ল, কেউ কেউ বশ্যতা স্বীকার করে নিল, কেউ বা অন্যত্র চলে গেল। আর্যরা অক্লান্তভাবে তাদের জয়লাভের ফলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনো পূর্বতন অধিবাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাড়িয়ে দিল, কখনো পতিত জমি বা অরণ্যভূমি পুড়িয়ে দিল, কখনো বা পরাজিত শত্রুকে আর্যীকরণের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিল বা মিশ্র বিবাহের মাধ্যমে আরো বহু কৌমকে ক্রমশ আত্মসাৎ করে নিল । ব্রাহ্মণসাহিত্যে এই প্রক্রিয়াই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রক্রিয়া থাকার সময়েই যেসমস্ত নুতন সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রকট হ'ল, তাদের মধ্যে রয়েছে : বহু রাজতন্ত্রের উত্থান, স্পষ্টভাবে সীমানির্দিষ্ট (পর্বত, নদী বা অরণ্যের মতো প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা নিরাপিত) ভূমিভাগ, ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রাচীরবেষ্টিত নগরের পত্তন, ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ ও বহুবিধ বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর আবির্ভাব, নূতন নূতন প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতির সূত্রপাত, অন্তত প্রথম পর্যায়ের তিন বা চার শতাব্দী-ব্যাপী সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কৃষিকার্য, পশুপালন আর অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার।

পাণিনি উত্তরাপথ, তক্ষশীলা ও তাম্রলিপ্তের মধ্যে বাণিজ্য-পথ এবং নানা মূল্যমানের ও নানা অভিধাযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত

হচ্ছে যে, সে সময় বিপুল বাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং সমাজে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছিল। পরবর্তী যুগে অর্থনীতি জটিলতর হয়ে ওঠে, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের প্রবণতা থেকে একদিকে ধনবান বণিক ও ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে দরিদ্র প্রাথমিক উৎপাদকের মধ্যে দেখা দেয়া ব্যাপকতর ব্যবধান। বৃত্তিগুলির মধ্যে সঞ্চরণশীলতা ক্রমাগত অধিকতর সংকুচিত হওয়ার ফলে সমাজের নিম্নস্তরে অতি দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের জীবন নির্বাহের জন্য কোনো পথই উন্মুক্ত ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, নিঃস্ব ও জীবিকাহীন শ্রেণীর শোষিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসমস্ত কিছুরই অনিবার্থ পরিণতিরীপে উপসিং-গঠনে বিপুল পরিবর্তন সূচিত হ'ল এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙক্ষার অভিব্যক্তিতে, ভাবনার জগতে দেখা গেল নুতন তরঙ্গাভিঘাত।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বিবিধ : প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য। যুদ্ধে প্রাগার্যরা নিশ্চিতভাবে পরাভূত হওয়ার পর সমাজে সাধারণভাবে যে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হল, তা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নানা মন্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের দুটি দেবকাহিনীতে (১২ : ১, ২) জলপথ-প্রহরারত অনার্যদের বিরুদ্ধে আর্যদের যুদ্ধের পর্যায় এবং নুতন ধরনের লৌহনির্মিত অস্ত্র (বাজ) প্রয়োগের ফলে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারীদের পরাজয় প্রতিফলিত হয়েছে। বহু ব্রাহ্মণগ্রন্থে, বিশেষত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, আমরা প্রায়ই এমন কিছু অনুষ্ঠান নির্দেশিত হতে দেখি, যেগুলির সাহায্যে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজের জন্য একটি রাজ্য জয় করে নিতে পারে। বিভিন্ন উপাখ্যান, গল্প, লোকশ্রুতি এবং দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে কথিত 'পরিপ্লব' কাহিনীগুলিও ইতিহাসের মূল্যবান উৎস।

'পরিপ্লব' শতপথ ব্রাহ্মণ [১৩ : ৪ : ৩ : ২] শব্দটির অর্থ হ'ল পুনরাবৃত্তিময় ও বৃত্তাকারে আবর্তনশীল লোকশ্রুতি; এরূপ অভিধার কারণ, যজ্ঞানুষ্ঠানের

বছরে প্রতি দশ দিন, অন্তর প্রাচীন লোকশ্রুতি বর্ণনা শুরু করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শতপথে যে বাক্যে 'পারিপ্লব' শব্দটি পাই, তার ঠিক পরবর্তী বাক্যেই 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। মানবজাতির প্রত্নপৌরাণিক আদিপিতা মনুর বৃত্তান্ত দিয়ে প্রাচীন লোকশ্রুতির বিবরণ শুরু হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য যে গৃহস্থ একত্র সম্মিলিত হতেন, তারাই ছিলেন শ্রোতা। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, প্রকৃতপক্ষে যা বর্ণনা করা হত—তা স্বভাববৈশিষ্ট্যে অবৈদিক লোকশ্রুতি। আদিপিতা মনু থেকে সঞ্জাত ক্রমিক প্রজন্মগুলির বিবরণে যে সমস্ত নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই ব্যাবিলন ও মিশরের ঐতিহাসিক নৃপতিরূপে অনুমিত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নৌবাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল বলেই এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে এতটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল এবং এক-সময়ে তাঁরা আর্যদের পবিত্র লোকশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হন।

বিলম্বে আগত মহাকাব্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের উল্লেখ থেকে (যেমন : জনমেজয়, পরীক্ষিৎ, শৌনক, ভীমসেন, শ্রুতসেন, পুরুকুৎস, মরুত্ত, অবিক্ষিত) শতপথ ব্রাহ্মণের নবীনতা প্রমাণিত হয়। লোকশ্রুতির অন্তর্গত বিভিন্ন রাজার বীরত্বকাহিনী সম্ভবত কতকটা অতিরঞ্জিতভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। মহাকাব্যিক ও মহাকাব্যোপম নামগুলির (দ্বৈতবন, মৎস্য, ভরত, দুষ্যন্তপুত্র, সুদ্যুম্ন, শকুন্তলা, কাশী, শতানীক, সত্রাজিৎ, সাত্বত, ধৃতরাষ্ট্র) উল্লেখ থেকে বুঝতে পারি, শতপথ ব্রাহ্মণ নবীনতম রচনাসমূহের অন্যতম। পূর্বাঞ্চলকে এখানে (১৩ : ৮ : ২ : ১) অসুরদেশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্য আধুনিক অর্থেই ইতিহাসপদবাচ্য, অর্থাৎ সেখানে প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ গবেষক এক মত যে, মহাভারতের যুদ্ধ যদি সত্যই ঘটে থাকে, তবে তা খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল। তখন সংহিতা রচনা শেষ

পর্যায়ে। ব্রাহ্মণে কথিত হয়েছে যে, দুষ্যন্তপুত্র ভরত গঙ্গা ও যমুনা নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন; একই স্তবকে ইলাপুত্র পুরূরবারও উল্লেখ রয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সাহিত্যে বেশ কিছু বংশতালিকা পাওয়া যায়। শতপথ ও বংশ ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাপ্ত নিদর্শন ছাড়াও অন্যত্র যে সমস্ত তালিকা পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে সমসাময়িক বৌদ্ধ নথিপত্রের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ মজবিমনিকায়ে আশ্বলায়নকে বিখ্যাত বেদবিশেষজ্ঞ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, কৌষীতকি উপনিষদে পরিবেশিত তথ্যও এর অনুরূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় (যাঁকে দেব-দানবের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বভূ বলা হয়েছে) কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিবৃত হয়েছে। শতপথে (৫ : ১ : ১ : ১২-১৩) বিদেহরাজ জনককে যখন সম্রাট বলা হচ্ছে, সেসময়ে কুরুরাজদের নিছক 'রাজা' বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। [ঐতরেয় ৮ : ১৪; পঞ্চবিংশ ১৪ : ১ : ১২]। সম্ভবত, এতে বিদেহের উত্থান ও কুরুর অবনমন সূচিত, কেননা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়, সে-যুগে এ-ধরনের বিশেষণগুলির সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র তাৎপর্য ছিল। ক্রমশ কুরুরাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবও বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, যেহেতু এই যুগের শেষ পর্যায়ে কুরুরাজ্যের পণ্ডিতরা বিদ্যার্থীরূপে বিদেহ রাজসভায় উপস্থিত হচ্ছিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই শুধু তারা আকাঙক্ষী নন, অনুষ্ঠান পরিচালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও তাদের কাম্য। সম্ভবত, এই যুগেই সূচিত হয় পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা, শস্যহানি ও তজনিত দুর্ভিক্ষ [ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১ : ১০ : ১৭]। হয়ত বা সেই একদা-সমৃদ্ধ জনতা তখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পূর্বদিকে অভিপ্রয়াণ করে; পরবর্তী যুগের সাহিত্যে সেই বিপুল ও তাৎপর্যপূর্ণ আত্মিক আলোড়নের নিদর্শন পাওয়া যায়, যার ফলস্বরূপ নুতন নুতন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কম্বোজ বৈদিক

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করার ফলে ক্রমশ বৈদিকযুগের অন্তিম পর্বে সম্মুখ-সারিতে উপস্থিত হয়।

বংশ-ব্রাহ্মণ কম্বোজের ঔপমন্যব নামে জনৈক শিক্ষকের কথা উল্লেখ করেছে। কম্বোজ কৌমাবদ্ধ আর্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল না; সেখানকার ভাষাও যে ভিন্ন ছিল, তা পরবর্তী বৌদ্ধ ও মহাকাব্যিক সাহিত্যের নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। উত্তরকুরু অঞ্চলটি বিশেষ সম্মান ভোগ করত; এটিকে সাধারণ ভূগোলের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ : ২৯)। আমরা যে সমস্ত রাজার উল্লেখ পাই, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বিদর্ভের ভীম, গান্ধারের নগ্নাজিৎ, সৃঞ্জয়, কৌমের সোমক (যাঁর অন্য নাম সোমক সহদেব সৃঞ্জয়), ইন্দ্রের ব্যবহার্য অনুলেপে অভিষিক্ত দুমূখ পাঞ্চাল, বভ্রু, দৈবাবৃধ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বিভিন্ন স্তবকে প্রাপ্ত স্থাননামগুলি যেমন বাস্তব রাজ্য, নগর বা রাজধানীর পরিচয় বহন করছে, তেমনি ঐ নামগুলির মধ্যেও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের পরিচয় নিহিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে; সুতরাং, পুরাণের মতে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করেনি–ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।

সাত্বতরা দক্ষিণাঞ্চলের একটি জনগাোষ্ঠীর উল্লেখ করেছে, যাদের সঙ্গে ভোজ নামে পরিচিত ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল; এই উভয় হ'ল যদুকৌমের দুটি শাখা। ব্রাহ্মণের বিভিন্ন অংশে প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক কৌমের পরিচয় ও তাদের সংঘর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে : সৃঞ্জয় গোষ্ঠী থেকে জনৈক কুরুরাজার পলায়ণ বা গোষ্ঠীগত বিষয়ে কুরুদের দ্বারা দালভ্যকে ভৎসনা ইত্যাদি। কৌমগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছিল এবং যখন মধ্যম ও বৃহৎ রাজ্যগুলি সেইসব বিজয়ী গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা অধিকৃত হ'ল তখন

সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল।

রাজ-পদবী

দেবতাদের অধিরাজরূপে ইন্দ্রের নির্বাচনকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত করে রাজপদবীর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি প্রাসঙ্গিক দেবকাহিনী (৩ : ৪ : ২ : ২) বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়, তার সঙ্গে রাজপদ বিষয়ক 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্বের সাদৃশ্য খুব বেশি; প্রাথমিক স্তরে একটি প্রয়োজন অনুভূত হয়, পরে তার থেকে উদ্ভূত সমস্যাকে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। রাজপদবী তখন অভিষেকের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত। অভিষেকে সমবেত জনসাধারণের উদ্দেশ রাজপুরোহিত যে ঘোষণা করে : "হে জনগণ, ইনিই তোমাদের রাজা; ব্রাহ্মণের রাজা সোম; এর দ্বারা রাজা সোমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন"। তবে, রাজকীয় ক্ষমতা অভিষেকের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত হয় না, পার্থ নামক অনুষ্ঠান করেই রাজা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১: ৭ : ৪৪]। বহু স্তবকে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের কাছে রাজার সম্পূর্ণ অধীনতা প্রকাশিত। এও বলা হয়েছে যে, রাজপদবী লাভ করেই রাজন্য নর-ঋষভ (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৯ : ১৭ : ৭) বা নরশার্দূল (তৈত্তিরীয় ২ : ৭ : ১৫ : ৪৯) হয়ে ওঠেন।

অভিষেকের সময়ে রাজা দুটি দীক্ষা-অনুষ্ঠান পালন করেন–উগ্রী ও বশিণী; প্রথম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাঁর প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ, আর দ্বিতীয়টি শত্রুদের পর্যুদস্ত করার জন্য পরিকল্পিত। রাজপদের আদি তাৎপর্যগুলির অন্যতম ছিল রাজস্ব-সংগ্রহ; কয়েকটি দেবকাহিনীতে এই সত্য আভাসিত হয়েছে। রাজসূয়

যজ্ঞের আয়োজন করে 'রাজা' পদবী লাভ করা যেত, অন্যদিকে বাজপেয় যজ্ঞের মাধ্যমে পাওয়া যেত উচ্চতর পদ সম্রাট। রাজার অন্যান্য উপাধি যেমন : ক্ষত্রপতি, বলপতি, ব্রহ্মাপতি, রাষ্ট্রপতি, বিট্‌পতি–তাঁর গৌণ বিশেষণ। অন্যান্য বিশেষণগুলি, যেমন, পরমেষ্ঠী, মহারাজ, সার্বভৌম ও একরাজ–এগুলি 'ইন্দ্রের' মহান অভিষেক অনুষ্ঠানের অনুসরণে অর্জন করতে হত [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ : ১৫]। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই আমরা আঞ্চলিক নামসহ নির্দিষ্ট কিছু উপাধি ব্যবহৃত হতে দেখি। পূর্বাঞ্চলের রাজা 'সম্রাট' রূপে অভিষিক্ত হতেন, দক্ষিণাঞ্চলের রাজারা 'ভোজ' (অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম শাসক) নামে অভিহিত, উত্তরাঞ্চলের রাজা বিরাট (যুক্তরাষ্ট্রীয় অরাজতন্ত্রী রাজ্যগুলির অধিপতি), পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজারা 'স্বরাট (স্বাধীন নৃপতি) এবং সুস্থিতিশীল মধ্যাঞ্চল অর্থাৎ কুরু, পাঞ্চাল, বাশা ও উশীনার-এর শাসকরা 'রাজা' রূপে চিহ্নিত হতেন। আবার 'পুনরাভিষেক' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজা আধিপত্যসূচক সমস্ত উপাধি লাভ করতে পারতেন।

কখনো কখনো রাজন্য, ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈশ্যদের মধ্য থেকেও অমাত্য ও পুরোহিত মণ্ডলী রাজাকে নির্বাচন করতেন। তত্ত্বগতভাবে কোনো অনার্যও রাজা হতে পারতেন; রাজা জনশ্রুতি তার দৃষ্টান্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে পৌত্রায়ণ শূদ্র বলে উল্লিখিত; তেমনি মরুত্ত আবিক্ষিত ছিলেন আয়োগবি জাতির অন্তর্গত অর্থাৎ শূদ্র পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। রাজপদবী প্রধানত নির্বাচনের মাধ্যমে নিণীত হত বলেই মনে হয়, তবে বংশগত রাজপদ সংক্রান্ত কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই নির্বাচন কখনো কখনো সমগ্র জনগোষ্ঠী বা তাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী এবং কখনো অমাত্যদের দ্বারা সম্পাদিত হ'ত; আবার শতপথে এমন একটি রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, যেখানে একই রাজবংশ দশ প্রজন্ম ধরে শাসন করেছে।

আদর্শ রাজা তার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন [তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২ : ৭ : ১৬ : ৫৮]। আবার, কোথাও কোথাও রাজাকে নরখাদক হত্যাকারী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। [শতপথ ১৩ : ২ : ৯ : ৬; কৌষীতকি ২ : ৬]। অনিয়ন্ত্রিত রাজকীয় ক্ষমতার দ্বারা স্বেচ্ছাচারিতার বিপদ তখনো ছিল, এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে সংযত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তা নিঃসন্দেহে প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করত। প্রথমত, এই নিয়ন্ত্রণশক্তি ব্রাহ্মণদের হাতেই ছিল, অভিষেকের মুহূর্ত থেকে তারা রাজার কাছে নিজেদের স্বতন্ত্র্য ঘোষণা করতেন। মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা একক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। অন্যদিকে গ্রামণী, সমাহর্তা ও সমিধাতার মতো কার্যনির্বাহকরাও প্রয়োগিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। রাজাও সাধারণত তাদের ওপরে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতেন না। রাজ্যের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সভা এবং সমিতি, জন, মহাজন বা পরিষদ (বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিস্‌স বা পরিসা) জনগণের আকাঙক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হ'ত; এমন কি, কোনো রাজার শাসনপদ্ধতিতে স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ দেখা গেলে সে সম্পর্কে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। শতপথে (১২ : ৯ : ৩ : ১) তাই দেখা যায় যে, সৃঞ্জয় বা কিছু কিছু অবাঞ্ছিত রাজাদের নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন : যেমন–রেবোত্তরস, পতিব, চক্র, স্থপতি ও দুষ্টরীষ্টু পৌংসায়ন। তেমনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও সিংহাসনচ্যুত রাজাদের নাম পাওয়া যায় [৮ : ১০]।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের উক্তিকে [৪ : ৪ : ২৩] এবং বিশেষত শতপথ ব্রাহ্মণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশে [১৩ : ৭ : ১ : ১৫] আমরা এমন একটি যুগের পরিচয় পাই যখন কৌম বা গোষ্ঠীর সম্পত্তিরূপে ভূমির প্রচলিত তাৎপর্য্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং রাজা ও সম্রাটরা

ভাবতে শুরু করেছেন যে, তারা ইচ্ছামতো ভূমি দান করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ জনমানসে এই ভূমিদাি্ন প্রথার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। এর পরবর্তী পর্যায়েই ভূমি ইচ্ছামতো ক্রয়বিক্রয়যোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল। নূতন নূতন কৃষিযোগ্য জমি প্রস্তুতির এবং পতিত ও গোষ্ঠীভোগ্য জমিতে পশুচারণের সাধারণ অধিকারগুলি ক্রমাগত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, সাধারণ কৌম অধিকারগুলির পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট জমিতে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের পৃথকভাবে স্থায়ী অধিকারের সূচনা তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের অন্যতম একটি সূত্র। এর ফলে কৃষিব্যবস্থার কাঠামো ক্রমশ এমনভাবে পরিবর্তিত হ'ল যে, ভূমির ব্যক্তিগত সত্বাধিকারই সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের অন্য বড় কারণ হ'ল ক্রমশ অর্থবিনিময় ব্যবস্থা গ্রামগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নগরায়ণের প্রবণতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। এ-সময়ই কৌম সমাজগুলি ভেঙে যাচ্ছিল; কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা গ্রামে বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠী বা কৌমের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, যদি কখনো কোনো বহিরাগত ব্যক্তি এসে তাদের মধ্যে বাস করতে চাইত,-কেননা এতে একই গোত্রসভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও গোষ্ঠী-জীবনের ছন্দ বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

অর্থনীতি (ব্রাহ্মণ)

ব্রাহ্মণসাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ব্যবসা, বাণিজ্য ও বহুবিধ প্রচলিত বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে। আমরা জানি যে, এই যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়,– আর্যদের বিজয়লাভের পরে যা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমন কি, দেশের মধ্যেও কুটীরশিল্প ও প্রধান শিল্প বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ফলে

সামাজিক শ্রেণী ও জাতিভেদ আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতির স্থান ধীরে ধীরে মুদ্রা ও স্বর্ণভিত্তিক ক্রয়বিক্রয় রীতি দ্বারা অধিগৃহীত হ'ল। যজ্ঞের প্রয়োজনে সোম ক্রয়ের একটি প্রতীক আমাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বাণিজ্যকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের প্রমাণ পাওয়া যায় [৩ : ৩ : ৩ : ১]।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পুরুষমেধের বর্ণনায় তৎকালীন বৃত্তিগুলির সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। প্রায় ৯৩ রকম পেশার উল্লেখ থেকে শ্রমের অসংখ্য উপবিভাগের বিস্ময়কর নিদর্শন এ-অংশে বিবৃত রয়েছে। এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র এখানে পরিস্ফুট, যা তৎকালে সংখ্যা, আকৃতি ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ক্রমবর্ধমান নগরগুলির প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ ছিল। সেই সঙ্গে সে যুগের বাস্তব জীবনের মান এবং ঐশ্বর্যশালী বণিকশ্রেণী ও সমাজের অন্যান্য সমৃদ্ধ অংশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন সম্পর্কেও আমরা একটি ধারণা পাই।

সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আমরা 'জ্ঞান' অর্জনের পক্ষে সহায়ক একটি মানসিক পরিমণ্ডল দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে এই যুগেই জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষিত ও উন্মোচিত হচ্ছিল। অন্তিম পর্যায়ের সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে বহুবিধ রোগ উল্লিখিত; কিন্তু অথর্ববেদ পাঠ করে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, ঐন্দ্রজালিক আবেশসৃষ্টির পাশাপাশি রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাও চলছিল। ওষধি, মণিরত্ন ইত্যাদি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক নির্দেশ সম্ভবত স্বভাব বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণত ঐন্দ্রজালিক ছিল না। গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগের একটি বাক্যে [১ : ১৯] রোগ পর্যবেক্ষণ চমৎকার প্রমাণ রয়েছে : 'বিভিন্ন ঋতুর সন্ধিকালেই রোগ বর্ধিত হয়।' বিজ্ঞানরূপে চিকিৎশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় শেষ পর্যায়ের সমাবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে।

আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনেই জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছিল; মিশর ও ব্যাবিলনের প্রভাবে এদেশে জ্যোতিবিদ্যা চর্চার শুরু। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়। তারকাপুঞ্জের বিবরণ দিয়েছে। অধ্যয়নের বিষয়বস্তুরূপে তালিকায় দেওয়া হয়েছে চার বেদ, ইতিহাস, লোকশ্রুতি, বীরদের এবং ঋষিদের সম্বন্ধে উপাখ্যান, ব্যাকরণ ও দর্শন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এই তালিকার সঙ্গে সাপবিদ্যা ও উপদেবতা বিষয়ক জ্ঞানকে যুক্ত করেছে। এছাড়া, আমরা দেখেছি যে, স্থাপত্য, ধাতুবিদ্যা ও জ্যামিতিরও তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিক ছিল।

ব্রাহ্মণযুগের বস্তুগত সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল ধাতুবিদ্যায় লক্ষণীয় অগ্রগতি। সিন্ধু সভ্যতার ভগ্নাবশেষ থেকে বহু ধাতুর ব্যবহার প্রমাণিত হয়। আক্রমণকারী আর্যরা ধাতু গলানো ও ধাতুশিল্পের বিজ্ঞান পরাজিত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে শিখেছিল, আর সম্ভবত প্রথম পর্যায়ে তাদের মধ্য থেকে কারুশিল্পীদের নিয়োগ করেছিল; এরাই ছিল শূদ্র, দাস ও দস্যু যারা উত্তরাধিকারক্রমে আর্যদের জন্য শিল্প ও কারুশিল্পের একটি ধারা গড়ে তুলল। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখছি [৫ : ৪ : ৪ : ২২] যে, রাজসূয় যজ্ঞের উদগাতা একটি সোনার হাতা পেতেন, হাোতা পেতেন সোনার থালা আর দুজন অধ্বর্যু দুটি সোনার আয়না পেতেন। গোপনব্রাহ্মণ পূর্বভাগ ১ : ২৪-২৬] থেকে সোনা, রুপা, লোহা, সীসা ও টিন-এর কাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত এবং ধাতুগুলিতে রাসায়ণিক ও তাপ-প্রয়োগের উল্লেখ পাচ্ছি। জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণ [৪ : ৩ : ৩] থেকে ধাতু গলানো ও খাদ মেশানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হই। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে [৩ : ১১ : ৮ : ৪৮-৪৯] সোনা গলানোর অসুবিধাগুলির উল্লেখ আছে। কাঠ ও চামড়ার

কাজ সম্পর্কেও বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় (যেমন তৈত্তিরীয় ১ : ৪ : ১ : ৩, ৪]।

ব্রাহ্মণসাহিত্যে সেই সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে যেটি মাংসাশী যাযাবর পশুপালক স্তর থেকে নব্য বিশ্ববীক্ষাসম্পন্ন, নিরামিষাশী কৃষিজীবী স্তরে বিবর্তিত হচ্ছিল–কেননা মেসোপোটামিয়ার মতোই নদীবিধৌত ব্রহ্মার্ষিদেশে ও উপত্যকাতেও কৃষিকাজ ছিল খুবই সহজ ও লাভজনক বৃত্তি। অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগুরু জনতা স্বভাবত খাদ্যশস্য উৎপাদনে অধিক মনোযোগী ছিল কেননা এখানকার মধ্যম-শ্রেণীর জমিতেও ফসল ভাল হত। জনগোষ্ঠী এভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় পর্যায়ের পশুচারী অশ্বারোহী অবস্থা থেকে নব্য গোপালক শস্যভোজী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সমগ্র ব্রাহ্মণ – -সাহিত্যে গোষ্ঠীর সম্পত্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে ধেনু স্বীকৃত হয়েছে; এছাড়া বাহন, কৃষির সহায় ও ভারবাহী পশু কিংবা খাদ্য ও যজ্ঞীয় বলি–বিশেষত দক্ষিণারূপে–ঘোড়া, ষাঁড়, বলদ, হাতি, গাধা, খচ্চর, গোরু, বাছুর, ভেড়া ও ছাগলের উল্লেখ লক্ষ্য করি। জনসাধারণ পর্যাপ্ত গোসম্পদ কামনা করত; এই লক্ষ্য মনে রেখেই তারা যজ্ঞের আয়োজন করত–আর, সমাজ বিপুল গোসম্পদের অধিকারীকেই ধন্যবান বলে গণ্য করত ।

পরিবার (ব্রাহ্মণ)

পিতৃতান্ত্রিক বা পরিবর্ধিত পরিবার ছিল সমাজে ন্যূনতম একক, সেইসঙ্গে নিবিড় সুখবোধের ভিত্তিভূমিও। জন্মদাতা রূপে পিতা সম্মানিত হতেন; পুত্রসন্তান যে চিরআকাঙ্খিত, তার অনেক প্রমাণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে রয়েছে। পুত্রকে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঐতরেয়

ব্রাহ্মণের একটি উক্তি বেশ কৌতুহলপ্রদ : 'পত্নী সহগামিনী, কন্যা দুঃখ, পুত্র ঊর্ধ্বতম স্বর্গের আলো, পুত্রহীন ব্যক্তি কখনো স্বর্গলাভ করে না' [৬ : ৩ : ৭ : ১৩]। বিবাহকে প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ অবিবাহিত পুরুষ যজ্ঞ করতে কিংবা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। পত্নী স্বামীর আদেশের অনুগতা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় যে, যজ্ঞমূলক ধর্মে গৃহস্থ যজমানের প্রয়োজন রয়েছে; তাই, এই ধর্মে এমন মূল্যবোধের ন্যায্যতা প্রমাণ এমন কি জনগণের উপর তা আরোপ করাও বাধ্যতামূলক যা সন্ন্যাসকে নিন্দা করে, বিবাহিত জীবনকে শুধু উৎসাহই দেয় না, আবশ্যিকও করে তোলে। জীবনের চারটি পর্যায়ের মধ্যে অন্তত দুটি-প্রথম ও শেষ (ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস) ভিক্ষাদানের উপরই নির্ভরশীল : স্পষ্টত এবং একমাত্র গৃহস্থের পক্ষেই ভিক্ষা দান সম্ভব। গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্বভাগে [২ : ৭] তাই এই বিধি রয়েছে : 'প্রতিদিন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দান করা গৃহস্থের কর্তব্য, নতুবা তাদের অকল্যাণ নিশ্চিত।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [৫ : ৫ : ৫ : ৩০৭] বলা হয়েছে : 'সন্ধ্যায় আগত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।'

নারী (ব্রাহ্মণ)

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বহু অংশে নারীকে স্বামীর অর্ধাংশ বা যজ্ঞের পশ্চাৎঅর্ধ রূপে কিংবা সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এধরনের বেশ কিছু প্রশংসামূলক মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও তা সমগ্র চিত্রের একটি দিক মাত্র। অন্য দিকেই লক্ষ করি পুরুষ-প্রাধান্যের জ্বলন্ত ছবি-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যা অপরিহার্য অঙ্গ। নারীকে সাধারণভাবে পুরুষের তুলনায় হেয় বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যজ্ঞের সঙ্গে যজমান-পত্নীর সম্বন্ধ প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল; কেননা, যজ্ঞে সক্রিয় কোনো ভূমিকা না থাকলেও যজমান পত্নীর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। সম্ভবত, প্রাথমিক স্তরে মাঝে মাঝেই যজমানের পত্নী অনার্য

বংশোদ্ভূত হতেন এবং পরবর্তী স্তরে নারীর উপনয়ন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; এইজন্যে যজ্ঞে তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকত না। সমস্ত কৃষিজীবী সমাজের মতো মাতৃত্ব ছিল নারীর গুরুত্বের অপর কারণ। এটা শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত একটি বিধিতে স্পষ্ট [৫ : ২ : ৩, ১৩] যেখানে অপুত্রক নারীকে (পরিবৃত্তি বা পরিবৃক্তি) ত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে। নির্ধতি বা ধ্বংসের কুপ্রভাবগ্রস্ত বলে সন্তানহীনা নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং শাস্ত্রে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে। যেমন : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [৩ : ৫ : ৩ : ৪৭]। সমাজে নারীর অবস্থানের শতপথের একটি দেবকাহিনীতে [৪ : ৪ : ২ : ১৩] চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে : 'নারীর নিজ শরীরের উপর বা কোনো উত্তরাধিকারে কোনো রকম অধিকার-ই নেই।' আবার, বরুণপ্রঘাস অনুষ্ঠানে নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন : তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : [১ : ৬ : ৫ : ৩৫; শতপথ : ২ : ৫ : ২ : ২০] । বিধবা ইতোমধ্যে করুণার পাত্রী হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ পাচ্ছি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি প্রার্থনায় ইন্দ্রানীর মতো যেন অবিধবা হই । [৩ : ৭ : ৫ : ৫১]। ঐ গ্রন্থের একটি স্তবকে [২ : ২ : ৩২-৩৩] প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে সততাপূর্ণ চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে, একই সঙ্গে যা কাব্যমূল্যেও অসামান্য। তৈত্রিরীয়ে অন্যত্র [২ : ৪ : ৪ : ৪২] দাম্পত্য প্রণয়ের দেবতা ভগের প্রতি একটি প্রার্থনা পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে [১০ : ৫ : ২ : ১১, ১২] লক্ষণীয়ভাবে দাম্পত্য প্রেমকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও স্বর্গপ্রদ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে পুরুষের অনুগতরূপে নারীর ভূমিকা লক্ষণীয় : নারী অপরিহার্য কারণ গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজন নির্বাহ করা ছাড়াও সে

পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়,–বংশ ও সম্পদের অবিচ্ছিন্নতার জন্য যার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রথাগতভাবে যজ্ঞে নারীর নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। এই বাইরে নারীকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অথচ হীনতার প্রাণীরূপে বিবেচনা করা হত, যার অস্তিত্ব সহ্য করতে হলেও একই সঙ্গে কঠিন প্রহরা ও অধীনতার মধ্যে রাখাই ছিল বিধি। ব্রাহ্মণগুলির বক্তব্যের সুর ও সার্বিক প্রবণতা থেকে এটা স্পষ্ট। শতপথে [১৩ : : : ২ : ৮] বলা হয়েছে যে, সমৃদ্ধিশালী পুরুষের চারজন পত্নী, একজন পরিচারিকা ও চারশত দাসী থাকত : সমস্তই ভোগের জন্য। বহু পত্নীর স্বামী হতে পারাকে তখনকার সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতীক বলেই বিবেচনা করত [তাদেব ১৩ : ২ : ৬ : ৭]।

জাতিভেদ (ব্রাহ্মণ)

যদিও সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে একটিমাত্র মন্ত্রে চতুর্বর্ণ ও তাদের উৎপত্তি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি কিন্তু জাতিভেদের উল্লেখে পূর্ণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার ছিল। পাণ্ডিত্য ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার জন্য সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। পুরোহিতরা প্রকৃতই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিলেন; অগ্নির সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য কল্পিত হত। তাৎপর্যপূর্ণ দ্বৈতবোধের ফলে ক্ষত্রিয়কে দুজন দেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে; শতপথ ব্রাহ্মণের একটি স্তবকে (২ : ৪ : ৩ : ৬) ক্ষত্রিয় ইন্দ্র ও অগ্নিরূপে বর্ণিত। ক্ষত্রিয়কে যেমন ইন্দ্রের, তেমনি ব্রাহ্মণকে সোমের সমতুল্য করা হয়েছে। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩ : ১২ : ৮ : ৪৯-৫০) বলা হয়েছে যে, সামবেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, যজুর্বেদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদের সঙ্গে বৈশ্যের সম্পর্ক্য। অন্যদিকে বসন্ত হল ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্ম রাজন্যের

এবং শরৎ বৈশ্যের ঋতু। গোপথ ব্রাহ্মণ উত্তরভাগে (২ : ২) মতে জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী; ব্রাহ্মণ্য গৌরব, খ্যাতি, নিদ্রা, ক্রোধ, শম ও দৈব সৌরভ। অন্য কোনো বর্ণের নরহত্যা তেমন পাপ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণকে হত্যা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (শতপথ ব্রাহ্মণ : ১৩ : ৩.৫ : ৩); ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদ্বারা তৃপ্ত করা হলে যজ্ঞই তৃপ্ত হয়ে থাকে (তদেব, ৭ : ২ : ২৮)। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা 'নরদেব' ব'লে গণ্য।

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ দুমেজিল-এর মতে ত্রিস্তর বৈদিক সমাজ পুরোহিত, যোদ্ধা ও গো-প্রতিপালকদের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং ইতোমধ্যে তা যাজকতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনতর সাহিত্যে আমরা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, যোদ্ধা বা রাজন্য (বা ক্ষত্রিয়) এবং শূদ্রের উল্লেখ লক্ষ্য করি, তবে বৈশ্যের উল্লেখ পাই আরো দেরিতে; সম্ভবত এর কারণ এই যে, আর্যরা প্রাথমিক স্তরে যাযাবর ছিল এবং প্রাগার্যদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই তারা কৃষিকার্যে নিরত হয়।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুরোহিতশ্রেণী ছিল সর্বাধিক সুবিধাভোগী। ক্ষমতা ও অবস্থানের সুদৃঢ় হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেদের প্রভুত্ব অব্যাহত রেখেছিল। সুবিধাভোগী অবস্থানে তাদের উত্থানের সূচনা দেখি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। পুরোহিতের ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তি ঔ অতিপবিত্র বলে বিবেচিত হ'ত; এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, প্রাথমিক স্তরে এই গোষ্ঠী জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হ'ত; যাদের কার্যাবলী সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ বিধানে সমর্থ। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধী ব্রাহ্মণের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও রয়েছে। সাধারণভাবে কোনো পুরোহিতকে অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দেওয়া হত না কিংবা তার সম্পত্তিও কোনোভাবেই স্পর্শ করা যেত না। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সঞ্চরণশীলতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলেও ব্রাহ্মণের যুগে তা কতকটা বর্তমান ছিল। এরজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে [

১০ : ৪ : ১; ১০] দেখা যায় যে, শ্যাপর্ণ সত্যকমের পুত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় এবং কেউ বা বৈশ্য হয়েছিল।

সমাজে প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়। রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ট, ঐশ্বর্যশালী ও মর্যাদাবান ক্ষত্রিয় পরিবারের সদস্যরা উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন, এবং এরাই 'রাজন্য' পদবীতে ভূষিত হতেন। যোদ্ধা, এবং রাষ্ট্র ও সম্পদের রক্ষকরূপে সমাজে ক্ষত্রিয়দের বিশেষ সম্মানিত আসন নির্দিষ্ট ছিল। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল এবং ক্রমশ অধিক সংখ্যক বিষয়ে রাজারা ক্ষমতা অর্জন করতে লাগলেন, ততই একটি নূতন পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল, মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জার সঙ্গে রাষ্ট্রের যেমন সংঘাত দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনীয়ভাবে পুরোহিত্য-জাতি ও যোদ্ধাজাতির মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের বাতাবরণ এদেশেও সৃষ্টি হ'ল। এই দুটি জাতি দুটি ভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করত : আধ্যাত্মিক ও পার্থিব। যজ্ঞই যেহেতু সে সময় ধর্মের প্রচলিত ও পরিচিত রূপ ছিল এবং যজ্ঞে অপরিহার্য ভূমিকা ছিল পুরোহিতের ও পৃষ্ঠপোষক যজমানের, তাই এই দুজনেই সমাজে সর্বাধিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ দুজনের প্রত্যেকেই নিজেকে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে ভাবতে শুরু করেছিলেন বলে সমাজে। এ উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়রা যে সর্বদাই ব্রাহ্মণদের তুলনায় বেশি ঐশ্বর্যবান ছিলেন, তার সমর্থন পাওয়া যায় তৈত্রিরীয় ব্রাহ্মণে (৩ : ৯ : ১৪ : ৫৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮ : ২৩) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব যে তীব্র হয়ে উঠেছে, তার আভাস পাওয়া পাওয়া যায়। পৃষ্ঠপোষকরূপে যজ্ঞের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে রাজারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন, কীভাবে তাঁদের রাজকোষ প্রত্যক্ষভাবে পুরোহিতদেরই ধনবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল এবং কীভাবে কোনো কোনো পুরোহিত জনসাধারণকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানসম্পর্কিত নতুন নির্দেশাবলীর ফলে পুরোহিতদের প্রাপ্য

ও দাবি এমনভাবে বর্ধিত হ'ল যে, রাজ পুরোহিতদের প্রকৃত সম্পদই প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। সম্ভবত এ-সময়েই রাজপুরোহিতদের ভূমিদান করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল; সুতরাং, ঐশ্বর্যবান পুরোহিতশ্রেণীর উত্থানকে ক্ষত্রিয় রাজা নিজ ক্ষমতার পক্ষে বিপদসূচক বলে মনে করতেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের যদিও প্রায়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীলরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তবু ক্ষমতা ও পাদপ্রদীপের আলোক অধিকারের জন্য প্রশ্চিদদ্বন্দ্বিতার ফলে কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো বা প্রকাশ্য বৈরিতার সূচনা হয়। বাস্তব জীবনে ব্রাহ্মণ যে অভাব বোধ করতেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার বহুগুণ বেশি ক্ষতিপূরণ ঘটত— এই ছিল প্রচলিত ধারণা। অন্তর্দেশীয় সমৃদ্ধি ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারেরর সঙ্গে সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা এবং বৈভব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল—বিশেষত রাজা ও অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত বিপুল আড়ম্বর এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রজাসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি পর্যবেক্ষণ করে ব্রাহ্মণরা নিশ্চিতই প্ররোচিত বোধ করেছিলেন। আবার, তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা সত্ত্বেও রাজা ও তার অভিজাত পারিষদবর্গ ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি ও তাজনিত দম্ভের সম্মুখীন হয়ে নিশ্চিত ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে [১১ : ৬ : ২ : ৫] জনকের বিতর্কসভা (ব্রহ্মোদ্য) সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে এর আভাস রয়েছে।

নৌ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক পুঁজি বৈশ্যদের হাতে কেন্দ্রীভূত হ'ল; তা সত্ত্বেও তিনটি আর্য বর্ণের মধ্যে এরাই ছিল নিম্নতম। এদের বিপুল ক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য সমাজে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একটি নির্দেশে [৩ : ৯ : ৭ : ৩২] : 'বৈশ্যের পুত্রকে (রাজপদে) অভিষিক্ত করবে না।' আদিত্য, রুদ্র ও বসু-এই গণদেবতাদের মধ্যে বিভিন্ন কৌমের প্রতিফলন দেখা যায়; তাদেরও আবার

যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে কৌমগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল, যদিও তাঁদের মধ্যে চিরাগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল অব্যাহত; তার ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বেশ কিছু স্থানে পাওয়া যায়। আবার, কিছু কিছু অস্পষ্ট আভাস থেকে মনে হয়, অন্তত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণগত সঞ্চরণশীলতা অক্ষুন্ন ছিল। ঋষি মেধাতিথি বৎসকে অব্রাহ্মণ, শূদ্র নারীর পুত্র বলে অভিহিত করেছিলেন। বিতর্ক মীমাংসার জন্য তারা নিজেদের মন্ত্রসহ অগ্নিপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় বৎস শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণরূপে প্রমাণিত হয়েছিলেন [তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৪ : ৬ : ৬]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শূদ্রার পুত্রও জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ঋষি মেধাতিথির তুলনায় প্রশংস্যতার ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়েছিলেন; যদিও এই মেধাতিথি বৈদিক সুক্তেরও রচয়িতা।

শূদ্র উচ্চতর তিনটি বর্ণের ভৃত্য, অস্থাবর সম্পত্তি, এমনকি মাঝে মাঝেই ক্রীতদাসররূপে বর্ণিত হয়েছে। মহাব্রত অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছদ্ম যুদ্ধে একটি গোলাকৃতি চর্মখণ্ডের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পরের সঙ্গে বিসংবাদে প্রবৃত্ত হত; তখন অনুষ্ঠানের খাতিরে তারা পর্যায়ক্রমে পরস্পরকে দোষারোপ ও প্রশংসা করত [তৈত্তিরীয় ১ : ২ : ৬ : ৫০]। কিন্তু এটা এমন বেশি মাত্রায় প্রথা সিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কর্ম যে, এর মধ্য থেকে সম্ভাব্য কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক সূত্র আবিষ্কার করা খুব দুরূহ। এই বিবৃতির শেষে শূদ্রের উৎপত্তি স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হয়েছে : 'শূদ্র অসুর উৎসজাত।' অর্থাৎ পরাজিত আদিম অধিবাসীদের মধ্য থেকেই শূদ্রের উৎপত্তি। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে [২৭ : ১] বারাঙ্গনা অপেক্ষাও হীন ও অস্পৃশ্য বলে শূদ্র নারীকে বর্ণনা করা হয়েছে। শূদ্র বর্ণের কাছ থেকে অগ্নিকে অপসারিত করার কথা বলেছে শতপথ ব্রাহ্মণ [৬ : ৪ : ৪ : ৯]। সোম যাগের জন্য দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল থেকে সোম সংগ্রহ করত শূদ্রেরা; বিনিময়ে যে গোবৎসটি তারা মূল্য হিসাবে লাভ করত, তাও মধ্যপথে প্রহার

করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ত [কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১৭ : ১]। তৎকালীন সমাজে শূদ্রদের বিড়ম্বিত জীবনের সুস্পষ্ট চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অস্থাবর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত শূদ্রদের শ্রম ও তাদের দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত কিছুই আর্যসমাজের অপর তিন জাতির দ্বারা শোষিত হত,– কেননা তাদের পিতৃপুরুষেরা আর্য আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল ও যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল। আর্য সংস্কৃতির বৃত্তবহির্ভূত হওয়ার ফলে যজ্ঞে যেহেতু শূদ্রদের কোনো স্থানই ছিল না, তাই তাদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নানা তির্যক উল্লেখের মধ্যে থেকে প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। তবে, 'ধর্মসূত্র' রচিত হওয়ার পূর্বে শূদ্রদের পৃথক বর্ণরূপে স্বীকার করা হয় নি; রচনাগুলিতে তাদের সামাজিক অবস্থানের হীনতা সমর্থিত হয়েছে।

শূদ্রদের প্রতি সমাজের সর্বাধিক ঘৃণাসূচক মন্তব্য সম্ভবত তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে [৫ : ৮ : ১১] পাওয়া যায় : 'শূদ্র যজ্ঞের উপযুক্ত নয়, তার কোনো দেবতা নেই, কোনো দেবতা কখনো তাকে সৃষ্টি করেন নি; সুতরাং শুধুমাত্র অন্য সকলের পদপ্রক্ষালন করেই তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।' সমস্ত গ্রন্থই অন্তত এই ব্যাপারে একমত যে, শূদ্রের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক তৈরি করে কোনো দেবতাকে দূষিত করা উচিত নয়। শূদ্রের অনার্য উৎস ও ফলত আর্য দেবতার সঙ্গে তার সম্পর্কহীনতা, ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত; ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বহু অংশে দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করে শূদ্রকে সমাজে অপাঙক্তেয় প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রয়াস স্পষ্ট; কেননা, সে যুগে দৈবসম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতির প্রকৃত সমর্থনরূপে বিবেচিত হত। শতপথ ব্রাহ্মণে ।[১৪ : ১০১ : ৩১] বলা হয়েছে : 'নারী, শূদ্র, কুকুর ও কালো পাখি হ'ল অসত্য, পাপ ও অন্ধকার—তাই তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।' রচয়িতা নারীবিদ্বেষী ছিলেন কিনা এবং নারীর প্রতি সত্যই দৃষ্টিপাত করা

হত না কিনা, এই নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু শূদ্রের প্রতি অমানবিক ঘৃণা যে সমাজের প্রচলিত রীতি ছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই।

মহব্রত যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের পারস্পরিক নিন্দাবাদের সময় শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের 'ধনী অদাতা' রূপে সম্বোধন করে থাকে। সমাজে জাতিভেদের মতোই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভাজনও সমান তীব্র ছিল; স্পষ্টতই শূদ্রেরা উভয় দিক দিয়েই সর্বাধিক নিপীড়িত হত। তাই, আমরা ধনী ব্রাহ্মণ, ধনী ক্ষত্রিয় ও ধনী বৈশ্যের কথা শুনি, কিন্তু প্রায় কখনোই ধনী শূদ্রের কথা শুনি না। ধন যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের নিয়ামক হয়ে উঠছে, তার প্রমাণ পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১ : ৪ : ৮ : ৪৫)। স্বাভাবিকভাবেই তখনকার সমাজে ধন ও স্বর্ণের আকাঙক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এবং যজ্ঞ আয়োজনের পক্ষে তা বাস্তব প্রেরণাররূপে সক্রিয় থাকত। গৃহ, আত্মীয়, শস্য, গোধন, অশ্ব, রথ ইত্যাদির প্রাপ্তিও যজ্ঞের ফলরূপে বিবেচিত হত। সমাজের অল্পসংখ্যক লোকই যেহেতু ঐশ্বর্যবান হতে পারত, তাই অন্যদের মধ্যে ধনলাভের প্রবল আকাঙক্ষা এবং ক্ষতি বা হানির বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচুর প্রার্থনা রচিত হয়েছে। অসুর ও রাক্ষসদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত তীব্র নিন্দাসূচক উক্তিতে 'ব্রাহ্মণগুলি পরিপূর্ণ; তাদের সঙ্গে শূদ্রদের একমাত্র পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তরা তখনও আর্যদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু শূদ্ররা, বিশেষত ক্রীতদাসেরা, পরাজিত শত্রুরূপে এমন এক সন্ধিপত্রে অলিখিতভাবে স্বাক্ষর করেছিল, যার প্রত্যেকটি শর্ত তাদের পক্ষে হীনতাপূর্ণ অপমানকে চিরস্থায়ী করেছিল। সাধারণত তারা নিতান্ত সামান্য অর্থের বিনিময়েই পরিশ্রম করত, মাঝে মাঝে নামমাত্র বেতনই পেত। কিন্তু ক্রীতদাসদের জন্য কোনরকম বেতনের ব্যবস্থাই ছিল না। তীব্র দারিদ্র্য, অবিরাম দাসত্ব এবং ব্যক্তি বা সম্পত্তিতে অনধিকারের ফলে শোষক প্রভুদের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হ'ত না।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাত্যদের সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ রয়েছে। অথর্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়েও ব্রাত্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের বর্ণনায় প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খ স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। যদিও ব্রাত্যদের সকলেই রাজপদবীর অধিকারী ছিলেন না, তবুও তাদের সম্বন্ধে বিবরণে সমৃদ্ধিশালী কৌম রাজার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করি। গৃহস্থরা ব্রাত্যদের যে দানসামগ্রী অর্পণ করতেন, তাতে প্রত্যেকটি দ্রব্য ছিল বিলাসিতার প্রয়োজনে ব্যবহৃত। অতিথিরূপে ব্রাত্যদের অবস্থান থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এরা প্রকৃতপক্ষে কোনো অবৈদিক আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথর্ববেদেও ব্রাত্যরা সম্মানিত, বিশেষত জ্ঞানী ব্রাত্যের সাহচর্য আর্য রাজার পক্ষেও কাম্য ছিল। এই ব্রাত্যদের পরিচয় যাই হাোক না কেন, অথর্ববেদে দেখি তারা রক্ষণশীল বৈদিক ধর্মের অনুসরণ করতেন না। কিন্তু তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে ব্রাত্যদের অবস্থান ভিন্নতর। সামগীতিপূর্ণ সোমযাগের মর্যাদা যখন খুবই প্রবল, সেই সময়কার একটি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের ব্রাত্যদের অবস্থান সমাজের নিম্নতম সোপানের কাছাকাছি বলে নির্দেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা ব্রাহ্মণদের খাদ্য ও সম্পদ লুণ্ঠন করে, এদের ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। ব্রাত্যরা অদীক্ষিত হয়েও পবিত্র বৈদিক ভাষায় কথা বলে। কৃষিকার্য বা বাণিজ্য তাদের জীবিকা নয় এবং তাদের পোষাকও খুব উদ্ভট। এই ও ঘৃণার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা যায়, যদি ব্রাত্যদের আর্য জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতর অর্থাৎ অবৈদিক অংশরূপে গ্রহণ করি, যারা বৈদিক আর্যদের পূর্বে কোনো প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যায়। এদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রাগার্যদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে তাদের সহাদয় আতিথ্যলাভ করেছিলেন। বিখ্যাত গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিমতই পোষণ করতেন। আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই ব্রাত্যদের অধিকমাত্রায় সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে তারা বৈদিক আর্যদের শত্রুপক্ষে পরিণত হয়েছিলেন, আবার তাদের আর্য পরিচয়ও

যেহেতু অক্ষুন্ন ছিল, তাই নবাগতদের পক্ষে তা অস্বস্তি ও বিরক্তির কারণ হওয়ায় দ্বিধান্বিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

সামাজিক আচার (ব্রাহ্মণ)

আমরা জানি যে, প্রস্তকথার অন্যতম দায়িত্ব ছিল প্রচলিত সামাজিক রীতির বৈধতা প্রতিপাদন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তবে, প্রাথমিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য দেবার কোনো সুযোগ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি দেব কাহিনীতে (১ : ৭ : ৪ : ৪) নিজ কন্যা উষার প্রতি প্রজাপতির কামাসক্তি, তার জন্য প্রজাপতির প্রতি দেবতাদের ক্রোধ এবং রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতির শাস্তিদানের বর্ণনায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সমাজে অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিন্দিত হলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। অন্য একটি কাহিনীতে আমরা বুঝতে পারি যে, গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ না হলেও লোকসমাজে তার প্রচলন ক্রমে কমে আসছিল।

বিভিন্ন ব্রাহ্মণে ঋষিদের প্রতি সমাজের বিশেষ সম্মান বোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস যে প্রবর্তিত হয়ে গেছে, তারও প্রমাণ আমরা এ সাহিত্যে পাই। সামাজিক রীতিনীতি জনপ্রিয় ধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তবে, রক্ষণশীল বা প্রশাসন-অনুমোদিত ধর্ম থেকে লোকায়ত ধর্মের বৃত্তকে পৃথক করা সত্যই খুব দুরুহ; বিভিন্ন তথ্য আমরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করতে পারি মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মীয় আচারকে বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত করা হয় নি বলেই আমাদের এই বিভাজন সম্পর্কে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ব্রাহ্মণ

সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে 'ব্রহ্মা' অর্থাৎ অথর্ববেদের পুরোহিতকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্য তিন প্রধান পুরোহিতের মতো তার জন্য কোনো মুখ্য কর্তব্য যেহেতু নির্দিষ্ট করা যায়নি, তাই তাকে অধিকতর অপরিহার্য করে তোলার একটি চেষ্টা চলেছিল, বিশেষত অথর্ববেদের ধারার মধ্যে। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (৫ : ১১) বলা হয়েছে যে, বাক্যের দ্বারা কর্ম অন্য পুরোহিতেরা করেন, কিন্তু মনের দ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম শুধু ব্রহ্মাই করে থাকেন। এই সঙ্গে আমরা এও বুঝতে পারি যে, এ সময় মন ও চিন্তার প্রাধান্যের প্রতি প্রবণতা ধর্মে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; তা না হলে, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। রচনাকালের দিক দিয়ে যত আমরা অর্বাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির সঙ্গে পরিচিত হই, ততই দেখি যে, তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে; যেমন গোপথ ব্রাহ্মণে নিম্নোক্ত দ্বাদশ সংস্কার উল্লিখিত : গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্কমণ, অন্নপ্রাশন, গোদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, আপ্লবন ও অগ্নিহোত্র। যে সমস্ত জনপ্রিয় ধর্মীয় উপাদান বহু শতাব্দী ধরে সামূহিক অবচেতনে নিহিত ছিল ও রক্ষণশীল যাজকতান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত সেই উপাদানগুলিই লোকায়ত ধর্মের সাক্ষ্য নিয়ে যজ্ঞধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

ঋগ্বেদে আমরা গন্ধর্ব্বদের উল্লেখ পাই; শতপথ-ব্রাহ্মণে বহু অপ্সরার অস্তিত্বও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় : মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচনী, অনুম্লোচনী, বিশ্বাচী, ঘৃতাচি, উর্বশী ও পূর্ববিত্তি। এদের মধ্যে উর্বশীকে কেন্দ্র করে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত সংবাদ-সূক্তটি গড়ে উঠেছে। অপ্সরার সম্পর্কে বিশ্বাস যে অন্তত পক্ষে ইন্দোইয়োরোপীয় ঐতিহ্যের মতো প্রাচীন, তা গ্রিক ও ল্যাটিন দেবকাহিনীগুলিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিশ্বাস যে যজ্ঞধর্মে অনুপ্রবিষ্ট তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভবত লোকায়ত ধর্মের বিভিন্ন উপাদানের ইন্দ্রজাল ও

জাদুবিদ্যার অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত, অর্থাৎ যে সমস্ত অনুষ্ঠানকে কোনও আপাত যুক্তির সাহায্যে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা দেখা যায় নি, তাও এর মধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে, এখানে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সমস্ত প্রাচীনপহী যাজক-তান্ত্রিক ধর্মেই ইন্দ্রজাল ও জাদুবিদ্যা অবিচ্ছেদ উপাদােনরূপে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রতিফলিত লোকায়ত ধর্মকে এদের থেকে পৃথক করার একমাত্র মাপকাঠি হ'ল ছদ্মযুক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি।

সমাজের প্রত্যাশা ছিল এই যে, মানুষ সতর্কভাবে জীবনধারণ করে তার শতবর্ষব্যাপী আয়ুষ্কালের পূর্ণ সদব্যবহার করবে এবং অবহেলায় তার পরমায়ুর কোনও অপচয় করবে না। মানুষ তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে : দেবষণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ। দেবখণ পরিশোধ করার জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন, ঋষিঋণ পরিশোধ করার জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এবং পিতৃঋণ শোধ করতে হলে পুত্র উৎপাদন আবশ্যক।

শিক্ষার্থী অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর গভীর ও রহস্যময় তাৎপর্য সম্পর্কে গোপথ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে পিতৃপুরুষেরণজ্ঞানচর্চার ধারা পরিশীলিত হত। অক্ষর-জ্ঞান আবিষ্কৃত হবার পূর্বস্তরে সমাজে সর্বপ্রকার জ্ঞানই মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হ'ত; ফলে বিদ্যার্থী স্বভাবতই ঐতিহ্যগত বিদ্যার আধার ও সঞ্চরণের আধার হয়ে উঠত এবং ব্রহ্মচারীর উপর আধ্যাত্মিক কিছু অনুষঙ্গ আরোপিত হত। ব্রহ্মচারীকে তপস্বীর কঠোর বিধি অনুসরণ করতে হত, সংগীত উপভোগ বা নৃত্যে অংশগ্রহণ কিংবা উষ্চশয্যায় নিদ্রা ইত্যাদির অধিকার তার ছিল না। জ্ঞানলাভের জন্য অপূর্ব তৃষ্ণা ও সম্ভ্রমবোধ এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার একই সঙ্গে আমরা জ্ঞান ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস পাই। ব্রাহ্মণ ও

উপনিষদগুলিতে জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত শ্রদ্ধার বিশেষ এক ধরনের তাৎপর্য লক্ষ্য করি।

দেবতা ও অসুর

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেই দেবতারা দেবত্ব অর্জন করেছিলেন, এবং তাদের বিজয়লাভের মূল কারণও যজ্ঞ। সংহিতা পর্যায়ে কিন্তু ধারণা ছিল ভিন্ন ধরনের; সেখানে দেবতারা তাদের মহত্তর শৌর্য ও বীরত্বের দ্বারাই বিজয় অর্জন করেছেন। শতপথে কথিত হয়েছে যে, ছন্দের মধ্যে দিয়ে দেবতারা স্বর্গলাভ করেছিলেন; কিন্তু সংহিতায় স্বর্গই তাদের চিরন্তন আবাস, কোনও কিছুর সাহায্যে তা অর্জন করতে হয় নি। সংহিতার দেবতাদের নূতনভাবে শ্রেণীবিভক্ত করে পুনর্বিন্যাসের একটি প্রবণতা আমরা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে লক্ষ্য করি। একটি দেবসঙ্ঘরূপে বিশ্বেদেবাঃ-র উত্থান এমনই একটি দৃষ্টান্ত যার মধ্যে আমরা কিছু কিছু গণদেবতার ব্যক্তি পরিচয়ের ক্ষয়ের নিদর্শন পাই। অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেবতা শব্দের প্রাচীন বিশেষণগুলিতে পৃথক ব্যক্তিত্ব আরোপের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তারই ফলে দেবতাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং নুতনভাবে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার বহু অনুষ্ঠানই দেবকাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে, যেখানে কোনও নির্দিষ্ট দেবতার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে কোনও গুণ বা শক্তি বা অনুষ্ঠানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য দেবতারা নিজস্ব শক্তিতে কিংবা প্রজাপতির নির্দেশে কোনও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই গুণ যুক্ত করেন বা অভাব পূরণ করেন। এ ধরনের কাহিনী সংহিতায় প্রতিফলিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান দেবতার সম্পর্কে ধারণাকে সফলভাবে খণ্ডন করেছে; তাদের পূর্বতন গী◌ৌরব বহুলাংশে

নিস্প্রভ হয়ে গেছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় কখনও কখনও যজমান ভাবগতভাবে নিজেকে কোনো না কোনো দেবতার সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন। সোমযাগে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যজমান ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বস্তুত, দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী আধ্যাত্মিক ব্যবধান হ্রাস করার জন্য এটা একটি বিশেষ পদ্ধতি। তবে, সর্বাধিক শক্তিশালী যে বিবৃতির দ্বারা দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব, অসামান্যতা ও গৌরব সার্থকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তা আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১১ : ২ : ৩ : ৬) পাই : "দেবতারা একদা মরণশীল ছিলেন; 'ব্রহ্মত্ব' লাভ করে তাঁরা অমর হয়ে উঠলেন।" একদিক দিয়ে এটা দেবতার গৌরবকে সর্বাধিক ক্ষুন্ন করেছে, কেননা দেখা যাচ্ছে যে, তারা স্বভাবত অমর নন; ব্রহ্মের অলৌকিক শক্তির সাহায্যে তারা অমরতা অর্জন করেছিলেন। আবার 'ব্রহ্ম' বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি পুরোহিতদের ভাবমূর্তির পক্ষে বিশেষভাবে অনুভূত অভাববোধকে প্রকট করে তুলেছিল। ঐ উক্তিতে পুরোহিতরা দেবতাদের সঙ্গে একই আধ্যাত্মিক উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। পুরোহিতদের উন্নতমানের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতাদের স্বাধীনতা ও সর্বশক্তিমত্তার অবনমন ঘটেছে। যদি ব্রহ্মা ব্যতীত দেবতারা নিজেরাই তুচ্ছ মরণশীল মানুষের সমতুল্য হয়ে পড়েন, তাহলে যে জনগোষ্ঠীতে পুরোহিতদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির আধ্যাত্মিক সঞ্চয় পরিস্ফুট-তারও ভবিষ্যৎ যথার্থ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দেবতারাও যেহেতু সত্যরূপ ব্রতপালন করেন। শতপথ [১৪ : ১ : ১ : ৩৩] তাই তারা সন্ন্যাস ও ব্রতের দ্বারা ঋষিদের আদি প্রত্নরূপে পরিণত হন। অলৌকিক ও নৈতিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বই তাদের বিশেষ গৌরবের হেতু। বিশাল ও জটিল রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের শাসকরূপে শক্তিশালী রাজাদের সম্পর্কে জনসাধারণের যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছিল, সম্ভবত তারই নিগূঢ় প্রবর্তনায় একেশ্বরবাদের জন্ম। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিস্থিতি যে বাস্তব ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল, তারই প্রভাবে সার্বভৌম একেশ্বর রূপে প্রজাপতির উত্থান। উপনিষদের পূর্ণ বিকশিত অদ্বৈতবাদের

অব্যবহিত পূর্বে প্রায়-চুড়ান্ত ধর্মতাত্ত্বিক স্তর-রূপে একে গ্রহণকরা যেতে পারে। যদিও আমরা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে একেশ্বরবাদের কথা শুনি, মোটামুটিভাবে প্রচলিত ধর্মীয় বাতাবরণ তখনও বহুদেববাদী থাকলেও বহুদেববাদ ততদিনে বহুলাংশে হৃতগৌরব ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং একেশ্বরবাদী প্রবণতা দ্রুত প্রভাবে বিস্তার করেছিল। প্রজাপতি এমন একজন বিমূর্ত-দেবতাররূপে ক্রম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রস্তকথা ও আনুষ্ঠানিক রহস্যবাদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বরের পক্ষে উপযুক্ত গুণাবলী যার উপর আরোপিত হচ্ছিল। শুভ ও অশুভের বিশ্বব্যাপ্ত সংঘাতরূপে দেবতা ও অসুরদের সংগ্রামকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করার প্রবণতা অবেস্তা গ্রন্থেও পাওয়া যায়-সেখানে আহুরমজদা ও আঙ্গামৈনুর মধ্যে নিরন্তর প্রতিস্পর্ধিতা পরিস্ফুট হয়েছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে দেবতা ও অসুররা ছিল প্রধান ভূমিকায়, লক্ষণীয় যে, উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, অসুরেরা সংখ্যায় অধিক, তাদের তুলনায় দেবতারা বয়ঃকনিষ্ঠ। ঋগ্বেদের মতো দেবতারা তত শক্তিশালী বীর নন, যাদের পরাক্রমের কাছে অসুররা পর্যুদস্ত। অসুর অর্থাৎ প্রাগার্যরা পরাজিত হলেও ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরূপে তারা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে চিত্রিত। তাকে বারংবার অসুরদের কাছে দেবতাদের পরাজয়বরণের কাহিনীর উপস্থাপন ঋগ্বেদের চিত্রের বিরোধী এবং ব্রাহ্মণ-প্রতিফলিত এই নূতনতত্ত্বের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনো নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। দেবতাদের মহিমা ক্রমশ খর্ব হওয়ার ফলে অন্য কোনো উপাদান দায়ী, এই সিদ্ধান্ত মাত্র আংশিকভাবেই সত্য, প্রকৃতপক্ষে নূতন আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসরূপে বিষ্ণু বা প্রজাপতির সঙ্গে একাত্মীভূতরূপে যজ্ঞের উপস্থাপনার ফলেই চিরাগত দেবতারা নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রাচীন, গৌণ দেবতা হলেও ব্রাহ্মণ সাহিত্য তার মহিমা এমন সতর্কভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন।

প্রজাপতি যেহেতু যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তার ভূমিকাকে একটু অন্যভাবে বিচার করা যেতে পারে; প্রায়ই বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির পরে প্রজাপতি যখন ক্লান্ত, তখনও কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতারা তাকে নুতনভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। সুতরাং যজ্ঞ স্বয়ং স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা প্রজাপতিরকেও নুতন জীবন দান করতে সমর্থ। তার গৌরব ও তাৎপর্য যেহেতু দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল এবং অন্যান্য দেবতারা সমানুপাতিকভাবে নিজেদের মাহাত্ম্য হারিয়ে ক্রমশ হীনপ্রভ হয়ে পড়ছিলেন, তাই একদিক থেকে সমগ্র দেবসঙ্ঘে একেশ্বরবাদের দিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগের ধর্ম যেহেতু মূলত যজ্ঞামূলক তাই যেখানে বহুদেবতার উদ্দেশে আহুতি অর্পিত হয়–সচেতনভাবে কোনো একেশ্বরবাদী প্রবণতা ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। যজ্ঞমূলক ধর্মের প্রয়োজনে ধর্মতাত্ত্বিকগণ অসংখ্য দেবকাহিনীতে প্রজাপতির ভাবমূর্তিকে এমনভাবে মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন যে, অন্যান্য দেবতারা তারই মহিমা ও করুণায় আশ্রিত হয়ে রইলেন। সংহিতা সাহিত্যে যেহেতু এরকম কোনো দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না, অন্তিম পর্যায়ের রচনায় অর্থাৎ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও অথর্ববেদে প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, আত্মা, স্কম্ভ বা কালের দেবতাকে তাই পুনর্বিন্যস্ত করে একজন সর্বোত্তম পরাৎপর দেবতার ভাবমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তত্ত্ব অর্থাৎ যজ্ঞের দেবরূপ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রজাপতি সর্বজ্যেষ্ঠ দেবতাররূপে বর্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন—এই বর্ষ কৃষিজীবী সমাজে কালগত একটি সম্পূর্ণ এককের প্রতিনিধি।

সময় সম্পর্কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ধারণা কতকটা জটিল–এর মধ্যে একধরনের স্ববিরোধিতা রয়েছে, যার প্রাথমিক আভাস সংহিতা সাহিত্যে উষা-সূক্তগুলিতে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে উষা স্বয়ং নিত্যনবীনা অথচ মানুষের জরার সে-ই হেতু, যেহেতু প্রতি প্রত্যুষে মানুষের পরমায়ু একদিন করে কমে

যায়। ব্রাহ্মণসাহিত্যে প্রজাপতি যে একই সঙ্গে খণ্ডকাল ও অনন্তকালের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন, তাতেই তার সর্বোত্তম মহিমা প্রমাণিত। কালের বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে এই সচেতনতার ফলে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হ'ল। স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট কৃষিজীবীর মনস্তত্ব স্থায়িত্ববোধের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। সম্পদ সঞ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারীদের জন্য সেই সম্পদ সংরক্ষণ করার একটি নূতন আগ্রহ দেখা গেল। জ্যোতির্বিদ্যা, বিশেষত নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কে নূতন উৎসাহ, সেই যুগের একটি বিশিষ্ট চরিত্র লক্ষণ, কারণ তৎকালীন মানুষ নিরবচ্ছিন্নতা ও চিরস্থায়িতা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল বলেই নক্ষত্রমণ্ডলী তাদের কাছে স্থায়িত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এসব অতিজাগতিক উপাদানের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নিজের নশ্বরতাকে মানুষ যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করল। একদিকে মানুষের জরা এবং মৃত্যু এবং অন্যপ্রান্তে দিন ও রাত্রির আবর্তনের হেতুরূপ সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে তৎকালীন মানুষ সূর্যকে জরা ও মৃত্যুর প্রেরয়িতারূপে গ্রহণ করেছিল। বর্ষ হয়ে উঠল। সময়ের প্রথম সসীম ও সম্পূর্ণ একক, একই সঙ্গে আবর্তনশীল ঋতুচক্র ও বর্ষ যেহেতু চিরবহমান কালের দ্যোতক-তার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশী রূপও আভাসিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে মানুষের নিজস্ব মৃত্যুবোধও তীক্ষতির অভিব্যক্তি লাভ করল।

নীতিবোধ (ব্রাহ্মণ)

মিসিং

যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রাণীদের উদ্দেশে অন্নদান এবং অতিথিসেবা। সুতরাং অতীত ঐতিহ্য, দেবতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, মানুষের বহির্জগৎ এবং সকল

প্রাণিজগতের সঙ্গে জীবন্ত যোগসূত্র রক্ষা করা হত। সে-যুগে আত্মসংস্কৃতির একমাত্র উপায় অর্থাৎ বেদধ্যয়ন থেকে লব্ধ সুফল সম্পর্কে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে প্রচুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, বেদধ্যয়ন মনকে পরিশীলিত করে, মনোনিবেশে সহায়ক হয় এবং যেহেতু জ্ঞানই মুক্তি দেয়, তাই শিক্ষার্থী স্বাধীন, আত্মনিয়ন্তা, জ্ঞানে পরিণত এবং ক্রমে যশস্বী হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের পক্ষে কাম্য চারটি বস্তু হ'ল : উত্তম বংশপরিচয়, জ্ঞান অর্জন, খ্যাতি ও জনসাধারণের মনকে জ্ঞানে আলোকিত করার দায়িত্ব পালন। নিজ কর্তব্য পালন করে ব্রাহ্মণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, দান গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযোগী পুরোহিত হওয়ার গুণাবলী অর্জন করে মৃত্যুদণ্ডের পরিসরের বহির্ভূত থাকতে পারেন। [শতপথ, ১১ : ৫ : ৭ : ১-২] ব্রাহ্মণের সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে বেদধ্যয়ন অর্থাৎ বেদ বিদ্যাকরাকেই অধিগত সর্বোত্তম ও যোগ্যতম রূপে প্রশংসা করা হয়েছে।

সত্য নৈতিক মূল্যের অন্তগতি; সত্যই ব্রহ্মা কিংবা দেবতাই সত্য; মানুষ অসত্য : ব্রাহ্মণে এধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অতিজাগতিক স্তরে সত্য হ'ল ঋত, যার প্রভাবে প্রকৃতি নির্দিষ্ট ছন্দে নিজেকে ব্যক্ত করে : এ যেন দেবতাদের অকথিত চুক্তি অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অব্যর্থ অলঙ্ঘনীয় অপরিবর্তণীয় ও অমোঘভাবে সক্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই বক্তব্যের নৈতিক তাৎপর্য এই যে, সত্যের অতিজাগতিক নিয়ম সকলকেই আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে, বাক্যে সত্যের অপলাপ বা কার্যে চুক্তিভঙ্গ পরিহার করতে হবে। বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে উদ্ভূত নুতন ভাববস্তুগুলির অন্যতম হ'ল শ্রদ্ধা; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে প্রথম এর সাক্ষাৎ পাই বলে একে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির সমসাময়িক রূপেই গ্রহণ করা যায়। আক্ষরিক ভাবে এর অর্থ হল 'বিশ্বাস'-ইন্দো-ইয়োরোপীয় একটি যে ধাতু (cred ১৪) থেকে এই শব্দটি উদ্ভূত; তার অর্থই বিশ্বাস! তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাকে বিশেষভাবে প্রশংসা

করা হয়েছে। যে যুগে কেউ কেউ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগিতা সম্পর্কে অসংকোচে সংশয় প্রকাশ করেছিল, সেই যুগে শ্রদ্ধা স্বভাবতই একটি নূতন তাৎপর্য অর্জন করেছিল। ব্রাহ্মণযুগে তপঃশক্তিকে ব্রহ্মের চূড়ান্ত প্রকাশরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তপঃশক্তির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিকাশ। তত্ত্ববিদ্যা, উদ্দেশ্যবাদ ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু নূতন মূল্যবোধও একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ উপনিষদ রচনায় এই সব নুতন চিন্তা দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মৃত্যু ও মরণোত্তর জীবন সম্পর্ক্যে নূতন ধরনের চিস্তার উল্লেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় সম্পর্কেও অভিনিবেশের সূচনা হয়। ব্রাহ্মণযুগে অবশ্য আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণই প্রাধান্য লাভ করেছিল। অন্ত্যেষ্টি সংস্কার সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সূত্রে জন্মান্তরিবাদেই আত্মসম্পর্কিত দার্শনিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় পাপ সম্পর্কে নূতন সচেতনতা; মরণোত্তর জীবনে পাপমুক্তির সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মননের সূচনা হয়। পাপপূণ্য এবং পরলোক সম্পর্কে যে ভাবনা এতে অভিব্যক্ত হয়েছিল। যেমন-শতপথ (১১ : ২ : ৬ : ১৩ ও ১১ : ২ : ৭ : ৩৩), তার সঙ্গে আমরা মিশরীয় ভাবনার তুলনা করতে পারি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগেই মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নৌবাণিজ্য সামরিক বিরতির পরে আবার নূতন এক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল। সম্ভবত, তারই ফলে মিশরীয় প্রেততত্ত্বের কিছু কিছু প্রভাব ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেখা দেয়। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবেও এর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। ব্রাহ্মণযুগের প্রেততত্ত্বে মোটামুটি তিনটি ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথমত, পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিকল্পরূপে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত; দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান পালনে ব্যর্থ বা পাপকর্মে নিরত ব্যক্তির জন্যই পুনর্জন্ম নির্দিষ্ট; তৃতীয়ত, পুণ্যাত্মা ব্যক্তির জন্য পুরস্কাররূপে পুনর্জন্মের নিবারণ নির্দিষ্ট অধিকার, অর্থাৎ চিরন্তন কোনো সত্বার জগতে সেই ব্যক্তির পুনর্জাগরণ। ব্রহ্মে বিলীন হওয়া সম্পর্কিত ধারণার সূত্রপাত তখনো হয়নি; তখনো সবচেয়ে আকাঙ্খিত ভবিষ্যৎ হ'ল আনন্দময় কোনো লোকে অমর মৃত্যুহীন

অস্তিত্ব। বস্তুত সুখী পার্থিব জীবনের ভাবগত সম্প্রসারণের দ্বারাই মৃত্যু-অতিক্রান্ত শাশ্বত জীবনের কল্পনা গড়ে উঠেছিল।